সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

জোজো অদৃশ্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ির পাশের গলিটায় এখন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। গাঢ় চকোলেট রঙের গাড়ি, প্রায় নতুনের মতন ঝকঝকে। সন্তু মাঝে-মাঝেই ছাদ থেকে উঁকি মেরে গাড়িটাকে দেখে। কখনও পায়রা কিংবা কাক গাড়িটার ওপর নোংরা ফেললে সন্তু দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আদর করে হাত বুলোয় গাড়িটার গায়। এর মধ্যেই সন্তু গাড়িটার একটা নাম দিয়ে ফেলেছে, গিংগো। সে ছাড়া এ নাম আর কেউ জানে না।

গাড়িটা দেখাশুনোর দায়িত্ব সন্তুর ওপর। কিন্তু এটা তাদের গাড়ি নয়। বিমানদা প্রায় জোর করেই গাড়িটা এখানে রেখে গেছে এক সপ্তাহ আগে। বিমানদা দেড় মাসের ছুটি নিয়ে গেছে জার্মানিতে। তার বাড়িতে গ্যারাজ নেই, গাড়িটা আগে রাত্তিরবেলা রাখা হত একটা পেট্রোল পাম্পে। কিন্তু এই দেড় মাস গাড়িটা সেখানে থাকলে তারা যদি ভাড়া খাটায়? যদি যে-সে গাড়িটা চালায়। সেইজন্য বিমানদা যাওয়ার আগে কাকাবাবুকে এসে বলেছিল, "গাড়িটা আপনারা রাখুন। আপনারা ব্যবহার করবেন।"

কাকাবাবু হেসে বলেছিলেন, "আমরা কী করে ব্যবহার করব ? আমি কি গাড়ি চালাই ? দাদাও গাড়ি চালাতে জানেন না। সন্তু এখনও শেখেনি। তা হলে ?"

বিমানদা বলেছিল, "একটা ঠিকে-ড্রাইভার রেখে দেবেন। যখন দরকার হবে, তখন গাড়িটা নিয়ে বেরোবেন। গাড়িটা শুধু-শুধু পড়ে থাকার চেয়ে মাঝে-মাঝে চালালেই ভাল হয়।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "কিন্তু গাড়িটা গলির মধ্যে রেখে দেবে, যদি চুরি হয়ে যায় ?"

বিমানদা বলেছিল, "আপনার বাড়ির পাশ থেকে গাড়ি চুরি করবে, কার এমন বুকের পাটা ?"

কাকাবাবু আবার হেসে ফেলে বলেছিলেন, "তুমি বলছ কী বিমান, গাড়ি-চোররাও আমাকে চেনে ? আমার নাম-ডাক অতটা ছড়ায়নি বোধ হয় !"

বিমানদা গাড়ি-চুরির ব্যাপারটা তবু গুরুত্ব দেয়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "চুরি হয় তো হবে ! ইনশিওর করা আছে। আমি পেট্রোল পাম্পে রাখতে চাই না।"

তারপর সন্তুর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "যদি ড্রাইভার না আসে তা হলে তুই রোজ একবার গাড়িটা স্টার্ট দিবি ! না হলে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তুই এর মধ্যে গাড়ি চালানো শিখেও নিতে পারিস !"

বিমানদা তো গাড়িটা রেখে দিয়ে চলে গেল। গাড়ি চালানো শেখার এরকম আচমকা সুযোগ পেয়ে সন্তুর দারুণ উৎসাহ হয়েছিল, কিন্তু বাবা জানতে পেরে বলেছিলেন, "ওসব চলবে না। পরের গাড়ি নিয়ে শিখতে যাবে, যদি ধাক্কা লেগে ভেঙেচুরে যায় ? যদি কখনও নিজে উপার্জন করে গাড়ি কিনতে পারো, তখনই গাড়ি চালাবে। তার আগে নয়।"

এর মধ্যে কাকাবাবু আবার দিল্লি চলে গেলেন, তাই ড্রাইভার রাখারও প্রশ্ন ওঠেনি। বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই চান না। মা মাঝে-মাঝে আপনমনে বলেন, "কতদিন থেকে একবার কালীঘাট মন্দিরে যাব ভাবছি, বরানগরের সেজোমাসি অনেকবার যেতে বলেছেন, একটা গাড়ি থাকলে কত সুবিধে, একদিনে সব সেরে আসা যায়, ওখান থেকে দক্ষিণেশ্বরেও ...।" বাবা এসব কথা শুনেও না-শোনার ভান করে থাকেন। মুখ ঢেকে রাখেন খবরের কাগজে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সন্তু তড়িঘড়ি গাড়িটা স্টার্ট দিতে যায়। বিমানদা শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ক'দিন ধরে শীত পড়েছে বেশ। সন্তু ফুলপ্যান্ট ও কোট পরে নিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে। গিয়ার নিউট্রাল করা থাকলে গাড়ি এগোবে না। সন্তু চাবি ঘুরিয়ে ক্লাচে পা রেখে চাপ দেয়। প্রথম কয়েকবার খ্যা-র-র খ্যা-র-র আওয়াজ হয়, তারপর গম্ভীরভাবে গাড়ির এঞ্জিনের স্বাভাবিক শব্দ বেরোয়।

তখন সন্তু মনে-মনে গাড়ি ছোটায়। নতুন বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে গঙ্গার ওপার। তারপর ফাঁকা রাস্তা। বম্বে রোড ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে গাড়ি, স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে, সামনে একটু ঝুঁকে সন্তু ফিসফিস করে বলে, "কাম অন গিংগো, আরও জোরে, আরও জোরে ...।" গাড়ি নয়, সন্তু যেন ঘোড়া ছোটাচ্ছে !

হঠাৎ গলি দিয়ে জোজোকে আসতে দেখে সে লজ্জা পেয়ে গেল।

জোজো ভোরবেলা কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোনওদিন গঙ্গার ধার, কোনওদিন বালিগঞ্জ লেক, কোনওদিন সল্টলেকের নলবন পর্যন্ত যায়। মাঝে-মাঝে সন্তুকেও ডাকতে আসে।

গাড়িটার বনেটে একটা চাঁটি মেরে জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু গাড়ি কিনলেন বুঝি ? কবে কেনা হল ? দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড !"

সন্তু বলল, "আমরা কিনিনি, এটা বিমানদার গাড়ি। মোটেই সেকেন্ড হ্যান্ড নয়, নতুন।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "আমায় গাড়ি চেনাবি ? কোন গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ভেঙে তুবড়ে গিয়েছিল, আবার সারিয়ে-সুরিয়ে রং করা হয়েছে, তা আমি এক নজরে বলে দিতে পারি। এই গাড়িটা একদিন রেড রোডে অ্যাকসিডেন্ট করেছিল, ধাক্কা মেরেছিল ট্রাকের সঙ্গে, ঠিক বেলা এগারোটায়।"

সন্তু বলল, "তুই বুঝি উপস্থিত ছিলি সেখানে ?"

জোজো দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

সন্তু বলল, "অ্যাকসিডেন্ট করতে পারে, কিন্তু রেড রোডে, বেলা এগারোটায়, তা তুই কী করে বুঝলি ?"

জোজো সন্তুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, "কী করে আমি বুঝি, তা যদি তুই বুঝতি, তা হলে তোর নামই তো জোজো হত ! চ, এ গাড়িতে ডায়মন্ড হারবার ঘুরে আসি।"

সন্তু স্টার্ট বন্ধ করে বলল, "কে চালাবে ? স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি বলে বুঝি ভাবছিস আমি চালাতে শিখে গেছি !"

জোজো বলল, "তুই শিখিসনি ? তা হলে সরে বোস, আমি চালাব !"

"তুই আবার শিখলি কবে ?"

"আমি তো বাচ্চা বয়েস থেকে চালাচ্ছি। সাহারা মরুভূমিতে জিপ গাড়ি চালিয়েছি। আর একবার উগান্ডার পাহাড়ি রাস্তায় ..."

"ভাই জোজো, এটা পরের গাড়ি, এটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না।"

"ডায়মন্ড হারবার যেতে আর কতক্ষণ লাগবে ? দুপুরের আগেই ফিরে আসব।"

"না ভাই থাক। যদি খারাপ-টারাপ হয়ে যায়।"

সন্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। জোজো হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "আমি জানতুম, তুই কিছুতেই আমাকে চালাতে দিবি না !"

সন্তু বলল, "সেইজন্যই বুঝি তুই বললি যে, তুই গাড়ি চালাতে জানিস ? আমাদের তো লাইসেন্স পাওয়ার বয়েসই হয়নি।"

জোজো বলল, "লাইসেন্স না পেলে বুঝি শেখা যায় না ? আমাকে একবার চাবিটা দিয়ে দ্যাখ না, বোঁ করে তোকে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে আসব !"

সন্তু সরু চোখে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইল।

জোজোকে বোঝা খুব মুশকিল, ওর কোন কথাটা যে সত্যি আর কোন কথাটা ডাহা গুল, তা ধরা যায় না। জোজোর এক মামার গাড়ি আছে, কিছুদিন জোজো সেই মামার গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছে, এ-বাড়িতেও সে গাড়িতে দু'বার এসেছিল, তখন হয়তো গাড়ি চালানো শিখে নিতেও পারে। সাহারা মরুভূমিতে জিপ চালিয়েছিল কি না, তার তো প্রমাণ পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

সন্তু বলল, "চল ভেতরে যাই।"

জোজো বলল, "আজ কী বার ? শনিবার। তোরা শনিবার সকালে লুচি-বেগুনভাজা আর মোহনভোগ খাস, তাই না ?"

সন্তু বলল, "সেটা রবিবার। আজ শুধু টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ। ওমলেটও হতে পারে।"

"ওমলেট ? একটা ডিমের, না দুটো ডিমের ?"

"একটা।"

"দুর-দুর ! ওমলেট যখন খাবি, ডাবল ডিমের না হলে ঠিক স্বাদ হয় না।"

"ঠিক আছে। মা-কে বলব তোকে ডাবল ডিমের ওমলেট করে দিতে।"

"টোস্ট খাস কেন, স্যান্ডুইচ খেতে পারিস না ? এই শীতকালে ভাল হ্যাম পাওয়া যায়। কিংবা সার্ডিন মাছ।"

"তুই বাড়িতে সকালবেলা কী খাস রে, জোজো ?"

"ওঃ ক'দিন ধরে কী দারুণ জিনিস খাচ্ছি। বাবার এক ভক্ত অনেকখানি ক্যাভিয়ার পাঠিয়েছিল। ক্যাভিয়ার কাকে বলে জানিস ? পৃথিবীর সবচেয়ে দামি খাবার। স্টার্জন মাছের ডিম। ক্যাস্পিয়ান সাগরের নাম শুনেছিস তো ? সেই সাগরে এই মাছ পাওয়া যায়। মাছটা এলেবেলে, ডিমটুকুই আসল। সহজে পাওয়া যায় না, তাই তো এত দাম !"

"এত চমৎকার জিনিস, আমাকে একটু খাওয়াবি না জোজো ?"

"কেন খাওয়াব না ? কাল সকালে আমাদের বাড়িতে চলে আয়। এক ধরনের বিশেষ বিস্কুটের ওপর মাখন মাখিয়ে তার ওপরে ক্যাভিয়ার রেখে খেতে হয়। খেলে তোর মনে হবে অমৃত ! অবশ্য আজ বিকেলবেলা ইজিপ্টের অ্যাম্বাসাডর আসবেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি পিরামিড দেখাবার জন্য আমাদের অনেকবার ওদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ওঁর মেয়ের খুব অসুখ, বাবার কাছ থেকে যজ্ঞিডুমুর নিতে আসছেন এবার। ওঁকে খাতির করার জন্য বাবা যদি সবটা ক্যাভিয়ার খাইয়ে দেন, তা হলে আর কাল সকালে কিছু পাবি না।"

সন্তু মনে-মনে ভাবল, কাল সকালে কেন, আজ সকালে, এক্ষুনি গেলেই তো হয়। জোজো কেন সে-কথা বলছে না ? সন্তু নিজেও মুখ ফুটে জোজোকে আজই যাওয়ার কথা বলতে পারল

না।

যজ্ঞিডুমুরটাই বা কী জিনিস কে জানে ! তাতে কঠিন রোগ সেরে যায় ?

ওপরের ঘরে গিয়ে ওমলেট আর টোস্ট খেতে-খেতে কিছুক্ষণ গল্প করল দু'জনে। এবার পড়াশুনোর সময়। ক্লাসের পড়ার চাপ না থাকলে সন্তু প্রত্যেক সকালবেলা একটি করে বাংলা বা ইংরেজি কবিতা মুখস্থ করে। তাদের বাড়িতে বাবা, কাকাবাবু, দিদি, এমনকী মায়েরও অনেক কবিতা মুখস্থ। মাঝে-মাঝে কম্পিটিশন হয়। কবিতা মুখস্থ করলে নাকি স্মৃতিশক্তি বাড়ে। একবার রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কে নির্ভুল বলতে পারে, তা নিয়ে কম্পিটিশন হয়েছিল। সন্তু ভুলে গিয়েছিল দুটো লাইন, ফার্স্ট হয়েছিল দিদি। দিদি অবশ্য এখন আর এ-বাড়িতে থাকে না।

সন্তু বলল, "আয় জোজো, আমরা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মুখস্থ করি। এইটা করবি, 'দুই পাখি'।

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে ...'"

জোজো সন্তুর হাতের বইটার দিকে উঁকি দিয়ে বলল, "ওরে বাবা, এ তো মস্ত বড় কবিতা, এটা একদিনে মুখস্থ হয় নাকি ?"

সন্তু বলল, "সবটা নয়, প্রথম দুটো স্ট্যাঞ্জা। এই যে 'আমি কেমনে বন-গান গাই !' এই পর্যন্ত। এক ঘণ্টা টাইম। তারপর মিলিয়ে দেখা হবে।"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "কম্পিটিশন ? আমার এক ঘণ্টাও লাগবে না। বড়জোর চল্লিশ মিনিট। আমি ফার্স্ট হলে

তুই কী খাওয়াবি বল ?”

সন্তু বলল, “চিকেন রোল। তুই হেরে গেলেও খাওয়াবি তো ?”

দু'জনে জোরে-জোরে পড়া শুরু করল কবিতাটা। দু'মিনিট বাদে থেমে গিয়ে জোজো বলল, “অ্যাই সন্তু, তুই আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করছিস ?”

সন্তু অবাক হয়ে বলল, “তার মানে ?”

জোজো বলল, “তুই প্রথমেই এই কবিতাটার কথা বললি কেন ? এটা তোর আগে থেকেই মুখস্থ আছে, তাই না ?”

সন্তু বলল, “না, না, আমার মুখস্থ নেই। সত্যি বলছি।”

জোজো বলল, “ওসব চালাকি চলবে না। কবিতা আমি বাছব।”

সন্তু বলল, “ঠিক আছে। তুই তা হলে বল কোনটা ?”

জোজো রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে বলল, “এই যে এইটা। 'সোনার তরী'। 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা' ... ।”

সন্তু বলল, “জোজো মাস্টার, এটা যে তোমার আগে থেকে মুখস্থ নয়, তা কী করে বুঝব ? এবার তুমি আমায় ঠকাচ্ছ ?”

জোজো বলল, “এই বিদ্যা ছুঁয়ে বলছি, এটা আমার মুখস্থ নেই। দু'-একবার পড়েছি অবশ্য। প্রথম একুশ লাইন আজ মুখস্থ করি আয়— ।”

এবারে পাঁচ মিনিট পড়ার পর সন্তু হেসে ফেলল।

জোজো থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “হাসছিস কেন ? এটা কি হাসির কবিতা নাকি ?”

সন্তু তবু হাসতে-হাসতে বলল, “আগের কবিতাটা আমার সত্যি মুখস্থ ছিল না। তুই বিশ্বাস করলি না। তুই যেটা বার করলি, এই

সোনার তরী আমার পুরো মুখস্থ। ধরে দ্যাখ ! আমি ভাই সত্যি কথা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না।”

জোজো বইটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “ধ্যাত ! আজ আর কবিতা-টবিতার দরকার নেই। এমন চমৎকার সকাল, চল না, কোথাও বেড়াতে যাই ! শীতকালেই বেড়াতে ভাল লাগে।”

“কোথায় যাবি ?”

“ট্রেনে উঠে কোথাও চলে গেলেই হয়। কাকাবাবু কোথায় রে, সন্তু ?”

“কাকাবাবু দিল্লিতে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।”

“কোনও রহস্যসন্ধানে গেছেন বুঝি ? তোকে এবার সঙ্গে নিলেন না ?”

“সেরকম কিছু ব্যাপার নয়। নরেন্দ্র ভার্মা ডেকে নিয়ে গেছেন। নরেন্দ্র ভার্মার সিমলায় একটা বাড়ি আছে। ওঁর এখন ছুটি। কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় ছুটি কাটাবেন শুনেছি।”

“এই শীতকালে সিমলায় ? সেখানে তো বরফ পড়ছে !”

“কাকাবাবু অনেকবার বলেছেন, শীতকালেই শীতের দেশে বেড়াতে যেতে হয়। লোকজন কম থাকে।”

“কাকাবাবু না থাকলে ভাল লাগে না। কোথাও না গেলেও অনেক গল্প তো শোনা যায় ! তুই নরেন্দ্র ভার্মার ঠিকানা জানিস ?”

“তা জানব না কেন ? ওঁর বাড়িতে আমি গেছি দু'বার।”

“একটা কাজ করবি সন্তু ? বেশ মজা হবে। তুই কাকাবাবুর নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে। তাতে লিখবি, জোজো মিসিং ! জোজোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসবেন।”

“মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠাব ? যাঃ, তা হয় নাকি ? ফিরে এসে

কাকাবাবু কী বলবেন আমাকে ?"

"মিথ্যে কেন হবে ? আমি ক'টা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকব। কিছুদিন ধরে সেরকম কিছুই ঘটছে না। কেউ এসে কাকাবাবুর সাহায্য চাইছে না। তা হলে আমাদেরই রহস্য তৈরি করতে হবে। আমি কোথাও লুকিয়ে থাকব। কাকাবাবু এলে তুই বলবি, কয়েকজন তাতার দস্যু এসে আমাকে গুম করেছে। তারপর দেখা যাক, কাকাবাবু কী করে আমাকে খুঁজে বার করেন।"

"মানুষ খোঁজা কাকাবাবুর কাজ নয়। উনি পুলিশে খবর দিয়ে দেবেন। তুই যেখানেই ঘাপটি মেরে থাকিস না কেন, পুলিশ ঠিক ক্যাঁক করে তোকে টেনে আনবে।"

"একবার জানিস তো সত্যিই আমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে না, কম্বোডিয়ায়। একটা পাহাড়ের গুহায় আমাকে হাত-পা বেঁধে লুকিয়ে রেখে তারা কম্বোডিয়ার রাজা সিহানুককে চিঠি পাঠাল যে কুড়ি লক্ষ টাকা র‍্যানসম, মানে মুক্তিপণ না পেলে তারা আমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে। রাজা তো সেই চিঠি পেয়েই ভয় পেয়ে গিয়ে টাকাটা পাঠাবার হুকুম দিয়ে দিলেন। আর একটু হলেই—"

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "কম্বোডিয়ার রাজা তোকে চিনলেন কী করে ? তিনি তোর জন্য টাকা দেবেন কেন ?"

জোজো এমনভাবে তাকাল, যেন সন্তু নেহাত ছেলেমানুষ। কিছুই বোঝে না। তারপর বলল, "বাঃ, আমার বাবা তো তখন কম্বোডিয়ায়। রাজার ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করছিলেন। বাবা সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে রাজাকে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, টাকা পাঠাতে হবে না। আমার ছেলেকে আটকে রাখার সাধ্য কারও নেই। বাবা সেই চিঠির দিকে সাত মিনিট তাকিয়ে রইলেন, রাগে তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল। তারপর পকেট থেকে পাঁচটা যজ্ঞিডুমুর বার

করে তাতে মন্ত্র পড়ে মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বললেন, যাঃ ! অমনই সেই ডুমুরগুলো গড়াতে লাগল। গড়াতে-গড়াতে রাজসভা ছেড়ে চলে গেল রাস্তায়। রাজার বাছাই-করা কুড়িজন সৈন্য ছুটতে লাগল সেই ডুমুরগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে একটা পাহাড়ের কাছে আসতেই দেখা গেল, পাঁচজন লোক সেই পাহাড় থেকে রক্তবমি করতে-করতে নেমে আসছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে তাদের মুখ দিয়ে। তারা সৈন্যদের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে বলতে লাগল, ক্ষমা চাইছি, মাপ চাইছি, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমাদের বাঁচান। শেষপর্যন্ত ওই ডাকাতদের রক্তবমি থামল কী করে জানিস ? প্রত্যেককে এই মন্ত্র-পড়া যজ্ঞিডুমুর একটা করে খাইয়ে দেওয়া হল।"

আবার যজ্ঞিডুমুর ? তার এত শক্তি !

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "যজ্ঞিডুমুর কী রে, জোজো ?"

জোজো বলল, "এক ধরনের ডুমুর, তুই দেখিসনি ? এমনিতে সাধারণ, কিন্তু মন্ত্র পড়ে দিলে এক-একরকম রেজাল্ট পাওয়া যায়। ওই ডুমুরগুলো খুব মন্ত্র ধরে রাখতে পারে।"

সন্তু বলল, "তোকে এখানে যদি কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে, তা হলে মন্ত্রও লাগবে না। ডুমুরও লাগবে না। কলকাতার পুলিশ খুব কাজের, তারা ঠিক খুঁজে বার করবে।"

জোজো বলল, "তবু পুলিশের বড়-বড় কর্তাদের প্রায়ই আমার বাবার কাছে আসতে হয়, তা জানিস ?"

সন্তু সে-কথা শুনল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "গলিতে কীসের শব্দ হচ্ছে।"

তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে ছাদের রেলিং ধরে উঁকি মারল নীচে। ঠিকই শুনেছে সন্তু। দুটো বাচ্চা ছেলে গাড়িটা নিয়ে খেলা শুরু করেছে। একজন চেষ্টা করছে দরজা খোলার জন্য, অন্যজন

চড়তে চাইছে গাড়িটার ওপরে।

সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, কী হচ্ছে কী ? গাড়িতে হাত দিবি না !"

জোজো বলল, "মাথায় ইট মারব। শিগগির পালা !"

ছেলে দুটি সঙ্গে-সঙ্গে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল।

প্রায় তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সামনে। তার থেকে নামলেন কাকাবাবু !

সন্তু আর জোজো দু'জনেরই মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। কাকাবাবু মুখ উঁচু করে ওদের দেখতে পেয়ে হাত তুললেন। তারপর ক্রাচ দুটো গাড়িতে হেলান দিয়ে রেখে পকেটের ব্যাগ থেকে ভাড়ার টাকা বার করতে লাগলেন।

জোজো হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "দ্যাখ, দ্যাখ, সন্তু, কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়াই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পা ঠিক হয়ে গেছে ! পা ঠিক হয়ে গেছে !"

সিমলা শহরে একটা নতুন হাসপাতাল হয়েছে। হরি সিং নামে একজন সেনাবাহিনীর বড় অফিসার একবার এভারেস্ট পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। শিরদাঁড়া জখম হওয়ার ফলে দুটো পা-ই নষ্ট হয়ে যায়। মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে গিয়ে এরকম কত দুর্ঘটনা হয়, কত মানুষ মরে যায়, কত মানুষ আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে থাকে সারাজীবন। সেই জন্যই হরি সিং অনেক চেষ্টা করে, অনেকের সাহায্য নিয়ে খুলেছেন এই

হাসপাতাল। নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি, ভাল-ভাল ডাক্তার রাখা হয়েছে, এখানে শরীরের হাড়গোড় ভাঙারই চিকিৎসা হয়। এখন অনেক পর্বত-অভিযাত্রী আহত হলেও এই হাসপাতালে চিকিৎসা করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে।

কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা ছুটি কাটাবার নাম করে কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সিমলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আসল উদ্দেশ্য, ওই নতুন হাসপাতালে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো। আজকাল কত নতুন-নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থা হয়েছে, অপারেশন করে প্রায় সবকিছু সারিয়ে দেওয়া যায়। কাকাবাবু সারাজীবন খোঁড়া থাকবেন কেন ?

কাকাবাবুকে প্রায় জোর করেই ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল সেই হাসপাতালে। মনোহর যোশি নামে একজন তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বলেছিল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার পা আমি এরকম মেরামত করে দেব যে, ক'দিন পরে আপনি আবার দৌড়তে পারবেন, লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন। ক্রাচ দুটো ছুড়ে ফেলে দেবেন !"

শেষপর্যন্ত অবশ্য কাকাবাবুর পা ভাল হয়নি !

আফগানিস্তানে সেই দুর্ঘটনার সময় কাবুলে ঠিক ভাল চিকিৎসা করা যায়নি। দিল্লিতে নিয়ে আসতে-আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন এতরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। কাকাবাবুর একটা পায়ের গোড়ালির হাড় একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে, ও আর এখন মেরামত করা যাবে না। একমাত্র উপায়, পায়ের খানিকটা একেবারে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে নকল পা লাগিয়ে দেওয়া। নকল পা নিয়েও মোটামুটি হাঁটতে পারা যায়।

কাকাবাবু নকল পা লাগাতে রাজি নন। তিনি বলেছিলেন,

"এত বছর ধরে ক্রাচ নিয়ে হাঁটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাট করার দরকার কী ? এই বেশ আছি।"

মনোহর যোশি খোঁজখবর নিয়ে বলেছিল, "আর একটা উপায় আছে। সেজন্য ইংল্যান্ডে যেতে হবে। ইয়র্কশায়ারে একটা হাসপাতালে হাড়-ভাঙার আরও আধুনিক চিকিৎসা হয়। সেখানে পা কেটে বাদ দিতে হয় না, অপারেশন করেও সবরকম পা-ভাঙা সারিয়ে দিতে পারে।"

কিন্তু বিলেতে গিয়ে থাকা, সেখানে চিকিৎসা করবার অনেক খরচ। অত টাকা কে দেবে ? কাকাবাবু বলেছেন, "আমার অত টাকা নেই, আমি এই ভাঙা-পা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব।"

তবে সিমলার হাসপাতালে গিয়ে কাকাবাবুর একটা উপকার হয়েছে। ওরা একজোড়া বিশেষ ধরনের জুতো বানিয়ে দিয়েছে, যা পরে থাকলে কাকাবাবু এক জায়গায় কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। হাঁটতে গেলে ক্রাচ লাগবে, শুধু দাঁড়িয়ে থাকার সময় লাগবে না।

ক্রাচ ছাড়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কাকাবাবুকে দেখলে মনে হবে, তাঁর পা ভাঙা নয়।

কাকাবাবু ফিরে আসার পর বাড়ির সবাই তাঁকে ঘিরে রইল। কাকাবাবু মজা করে বলতে লাগলেন সেই হাসপাতালের কথা। সন্তুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন অপারেশন করালাম না জানো বউদি ? তোমার কথা ভেবে। আমার খোঁড়া পা ঠিক হয়ে গেলে তুমি যদি জোর করে আমার বিয়ে দিয়ে দাও !"

মা বললেন, "পায়ে একটু খুঁত থাকলে বুঝি মানুষের বিয়ে হয় না ! তোমার ওপর জোর খাটাবার সাধ্য আছে আমার ?"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "নতুন জুতো পরে আমার একটা খুব উপকার হয়েছে। এখন আমি গাড়ি চালাতে পারি। দিল্লিতে

ফিরে চালালাম একদিন। অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই, তবু ভুলিনি। ড্রাইভার রাখতে হবে না, বিমানের গাড়িটা আমিই চালাতে পারব !"

পরদিন ড্রাইভার হয়ে কাকাবাবু মাকে নিয়ে গেলেন কালীঘাটের মন্দিরে, তারপর বরানগরে মাসির বাড়ি। তারপর নিউ মার্কেটে মা অনেকক্ষণ ধরে কেনাকাটি করলেন মনের সুখে। আজ তো আর ট্যাক্সি খুঁজতে হবে না।

অনেকদিন পর গাড়ি চালাতে শুরু করে কাকাবাবু খুব উৎসাহ পেয়ে গেছেন। ভোরবেলা উঠেই বললেন, "চল সন্তু, কলকাতার বাইরে কোনও জায়গা থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি। দিনটা সুন্দর, আমারও খানিকটা প্র্যাকটিস হবে।"

সন্তু বলল, "জোজো ডায়মন্ড হারবার যেতে চেয়েছিল। ওকে তুলে নিয়ে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! জোজো না থাকলে জমেই না। তা হলে ডায়মন্ড হারবারই যাওয়া যাক।"

জোজোর তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। তার বাড়িতে গিয়ে হর্ন দিয়ে ডাকতেই জোজো পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে উঠেই জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি সিকিম লটারির টিকিট কাটবেন ?"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "কেন বলো তো ? আমি তো কখনও লটারির টিকিট কাটি না। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?"

জোজো বলল, "ওই লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পঁচিশ লাখ টাকা। ওই টাকাটা আপনি পেয়ে গেলে বিলেতে গিয়ে পায়ের অপারেশন করিয়ে আসতে পারবেন। আমি সব শুনেছি, আপনি টাকার জন্য

বিলেতে যেতে পারছেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "লটারির টিকিট কাটলেই আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব ? এমন আশ্চর্য কথা তো কখনও শুনিনি।"

জোজো বলল, "টিকিটটা আপনি কেটে আমাকে দেবেন। আমার বাবা সেই টিকিটে এমন মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে দেবেন যে ওই টিকিট নির্ঘাত ফার্স্ট প্রাইজ পাবে !"

কাকাবাবু ভুরু দুটো তুলে জোজোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরকম মন্ত্র আছে নাকি ? মন্ত্রের এত জোর ! তা হলে জোজো, তুমি নিজেই আগে কেন লটারির টিকিট কিনে ফার্স্ট প্রাইজ জিতে নাওনি !"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "না, না, সেরকম নিয়ম নেই। সেটা চলবে না ! এই মন্ত্র যে জানে, সে কখনও নিজের জন্য কিংবা নিজের ছেলেমেয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে না। তাতে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। বাবা অন্যদের জন্যও এটা করতে চান না। আপনার জন্য স্পেশ্যাল কেস। এর আগে একবার শুধু একজন শিল্পীর সাত বছরের ছেলের হুপিং কাশি হয়েছিল, কিছুতেই সারছিল না, রাশিয়াতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার, তাই বাবা তাঁকে একটা লটারির সেকেন্ড প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

সন্তু ফস করে জিজ্ঞেস করল, "ওর বেলা সেকেন্ড প্রাইজ কেন ?"

জোজো বলল, "ছোট ছেলে তো, তার বেশি দরকার নেই !"

কাকাবাবু হেসে উঠে জোজোর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "শোনো জোজো। আমাদের দেশে কত ছোট ছেলে-মেয়ে হুপিং কাশি কিংবা আরও কতরকম অসুখে ভোগে। টাকার অভাবে তাদের চিকিৎসা হয় না। তোমার বাবাকে বলো,

তাদের সাহায্য করতে। একসঙ্গে অনেককে ফার্স্ট প্রাইজ, সেকেন্ড প্রাইজ, সব প্রাইজ পাইয়ে দাও। আমি এই ভাঙা পা নিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। আমার সাহায্যের দরকার নেই !"

জোজো বলল, "আর একটা ব্যবস্থাও করা যায়। তাতে বিশেষ টাকা খরচ হবে না। অবশ্য আপনি যদি রাজি থাকেন !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বিনা পয়সায় চিকিৎসা ? সেটা কী বলো তো ?"

জোজো বলল, "আমার একজন ছোটকাকার একবার ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মালাইচাকি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন, কোনওদিন আর হাঁটতে পারবেন না—"

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "জোজো, তোর ক'জন ছোটকাকা রে ?"

জোজো বলল, "ছোটকাকা আবার ক'জন হয় ?"

সন্তু বলল, "তুই যে বললি, একজন ছোটকাকা ?"

জোজো বলল, "একজন বলেই তো একজন বললুম !"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো আজ বেশ মুডে আছে। তারপর কী হল ? তোমার ছোটকাকার পা সেরে গেছে ?"

জোজো বলল, "আমার বাবা তাকে বললেন, তুই মধ্যপ্রদেশের মৃদঙ্গপুর পাহাড়ে চলে যা। সেখানে বিছাবজ্র নামে এক সাধু থাকেন। দুশো সাতান্নটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলে সেই পাহাড়ের মাথায় সাধুজির মন্দির। উনি কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলেবিছে এরকম অনেক রকম বিছে পোষেন। চোদ্দো-পনেরোটা সাপও আছে। ওই সাধু সবরকম ভাঙা হাড় জোড়া দিয়ে দিতে পারেন। ইঞ্জেকশনের বদলে কাঁকড়াবিছে। ভাঙা জায়গাটায় গোটা দশেক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেবেন, তারা হুল ফুটিয়ে-ফুটিয়ে ... সেটা সহ্য করতে হবে, সেইসঙ্গে সাধুজি মন্ত্র পড়া জল ছেটোবেন, ঠিক

সতেরো দিন! কাকাবাবু যদি ধৈর্য ধরে ওখানে সতেরোটা দিন থাকতে পারেন ... আমি আর সন্তুও যাব আপনার সঙ্গে। বিছ্বাবজ্র সাধু একটাও পয়সা নেন না, বরং হালুয়া আর ক্ষীর খেতে দেন!"

কাকাবাবু বললেন, "সতেরো দিনটা সমস্যা নয়। কিন্তু দুশো সাতান্নটা সিঁড়ি ভেঙে তো আমি পাহাড়চূড়ায় উঠতে পারব না! সিঁড়িতেই আমাকে কাবু করে দেয়!"

সন্তু মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বলল, "জোজো, আর একটা বল!"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আর একটা কী বলব?"

সন্তু বলল, "এইরকম আর একটা কিছু চিকিৎসার উপায় জানিস না?"

কাকাবাবু এমন মুখের ভাব করে বসে আছেন, যেন তিনি জোজোর সব কথা বিশ্বাস করেছেন।

গাড়িটা চলেছে ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্রাম আসছে। আবার কয়েকটা বড় বড় কারখানাও চোখে পড়ে। শীতকালের নরম রোদ ঝকমক করছে চারদিকে।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি এতদিন পর গাড়ি চালাচ্ছ, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?"

কাকাবাবু বললেন, "না রে। কিছুই ভুলিনি দেখছি। গাড়ি চালাতে পেরে বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি। ব্রেক চাপার সময় পায়ে একটু-একটু ব্যথা লাগছে, সেটাও এমন কিছু না।"

সন্তু বলল, "ভাগ্যিস বিমানদা গাড়িটা রেখে গিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, তুমিই তো ডায়মন্ড হারবার বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিলে। সেখানে কী-কী দেখার আছে বলো তো?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "ইলিশ মাছ!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "অ্যাঁ? ইলিশ মাছ?"

জোজো বলল, "ওখানে খুব টাটকা ইলিশ পাওয়া যায়। যারা বেড়াতে যায়, তারা দু-তিনটে করে কিনে নিয়ে আসে। একবার আমার এক মেসোমশাই বত্রিশটা ইলিশ কিনেছিলেন।"

সন্তু বলল, "বত্রিশটা? তোর মেসোমশাইয়ের বুঝি মাছের দোকান আছে?"

জোজো বলল, "মোটেই না। উনি মাছ খাওয়ার থেকেও মাছ কিনতে বেশি ভালবাসেন। মাছ কিনে এনে চেনা লোকদের বাড়িতে-বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আমাদেরও দুটো দিয়েছিলেন সেবার। অপূর্ব স্বাদ!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু এই শীতকালে তো ইলিশের স্বাদ থাকে না। ভাল ওঠেও না।"

জোজো বলল, "সরস্বতী পুজো তো পার হয়ে গেছে। ঠিক সরস্বতী পুজোর পর থেকেই আবার ওঠে।"

কাকাবাবু বললেন, "ইলিশ মাছেরা বুঝি জানে, কবে আমাদের সরস্বতী পুজো হয়?"

সন্তু বলল, "প্রত্যেক বছর তো একই দিনে সরস্বতী পুজো হয়ও না। বদলে-বদলে যায়।"

জোজো বলল, "সরস্বতী পুজোর পর নদীর জলটাও বদলে যায়। তার থেকেই ইলিশ মাছরা টের পেয়ে যায়! সরস্বতীর একটা মানে নদী, তা জানিস?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে একবার ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে কাকদ্বীপ গিয়েছিলাম। একটা ছোট হোটেলে খেয়েছিলাম, এমন চমৎকার রান্না যে, এখনও যেন মুখে স্বাদ লেগে আছে। টাটকা মাছ ভাজা আর পাঁঠার মাংসের ঝোল দিয়ে

গরম-গরম ভাত। এইসব ছোটখাটো হোটেলে খেতে আমার খুব ভাল লাগে। আজও ওইরকম একটা হোটেলে খাব।"

সন্তু বলল, "আমরা বিকেলের আগে ফিরব না।"

জোজো বলল, "আমাদের ফেরার তাড়া কী আছে? কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি, হারিয়ে তো যাব না?"

ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ধারে এসে দেখা গেল, প্রচুর গাড়ি আর মানুষজনের ভিড়। শীতকালে এখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ বেড়াতে আসে। অনেক পিকনিক পার্টি এসেছে, তারা মাইকে গান বাজাচ্ছে, সেই শব্দে কানে তালা লেগে যায়!

সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত ভিড় তার ভাল লাগে না। বাস ভর্তি-ভর্তি আরও লোক আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "একসঙ্গে তিন-চারটে মাইক বাজছে কাছাকাছি, এতে কোনও গানই তো ভাল করে শোনা যায় না! মাইক না বাজিয়ে এরা নিজেরা গান গায় না কেন?"

জোজো বলল, "চলুন, আমরা কাকদ্বীপে চলে যাই! আপনার সেই হোটেলে গিয়ে খাব!"

গাড়ি, ট্রাক, বাস আর রিকশায় রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে। কাকাবাবু কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে এগিয়ে চললেন। তারপর রাস্তা ফাঁকা পেতেই স্পিড দিলেন খুব।

কাকদ্বীপ পৌঁছতে দেরি হল না। কাকাবাবু অনেকদিন আগে যখন এসেছিলেন, তখন একটাই মোটে ভাত খাওয়ার হোটেল ছিল। এখন আরও কয়েকটা হোটেল হয়ে গেছে। তবু কাকাবাবু মনে করে-করে আগের হোটেলটাই খুঁজে বার করলেন। সেটার নাম 'নীলকণ্ঠ কেবিন'। প্রায় একই রকম রয়েছে। এর তুলনায় অন্য নতুন হোটেলগুলো আরও বড়।

জোজো বলল, "বেশ নাম দিয়েছে তো! নীলকণ্ঠ! তার মানে,

এখানে বিষ খেলেও হজম হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "খেলে বুঝবে, এরা বিষ দেয় না, অমৃত দেয়।"

বেলা বেশি হয়নি, মাত্র পৌনে এগারোটা। এর মধ্যে ভাত খাওয়া যায় না, কিছু লোক অবশ্য হোটেলের মধ্যে ভাত খাচ্ছে।

জোজো বলল, "আমার কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে। আমি ব্রেকফাস্টে বিশেষ কিছু খাইনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী খেয়েছিস? ক্যাভিয়ার দিয়ে টোস্ট খেয়েছিস?"

জোজো বলল, "আহা, সেটা তো ফুরিয়ে গেছে, তোকে খাওয়াতে পারলুম না। আজ খেয়েছি এক বাটি ঘুগনি, দুটো পরোটা, আর দুটো পরোটা খেলুম ঝোলাগুড় দিয়ে, আর নারকোলের নাড়ু কয়েকটা।"

সন্তু বলল, "এত খেলে আর দুপুরে আমি কিছু খেতামই না।"

জোজো বলল, "গাড়িতে চাপলেই আগেকার খাবার সব আমার হজম হয়ে যায়। সেইজন্যই খিদে পায়!"

কাকাবাবু বললেন, "বেলা একটার আগে লাঞ্চ খাওয়া যায় না, চলো খানিকক্ষণ ঘুরে আসি। এর মধ্যে আমরা একবার চা-বিস্কুট খাব। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? কাকদ্বীপে তো দেখার কিছু নেই।"

সন্তু বলল, "এইদিকে নামখানা বলে একটা জায়গা আছে না? সেখানে নদী পার হতে হয়। নদীটার নাম বেশ চমৎকার। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "চলো তা হলে নামখানা থেকেই ঘুরে আসি। ইচ্ছে হলে নদী পেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালিতেও যাওয়া যেতে পারে।"

উলটো দিক থেকে একটা ভ্যান আসছে, তাতে লাউড স্পিকারে কী যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। গ্রামের দিকে বড় ধরনের কোনও সভা-সমিতি হলে এইভাবে ঘোষণা করে। এই লাউড স্পিকারের আওয়াজ এত খারাপ যে, কথাগুলো বোঝাই যাচ্ছে না, শুধু মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে কাটা মুণ্ডু...পাঁচটা বাঘ... শূন্য থেকে ঝাঁপ... মুখের মধ্যে আগুন...”

একটা লোক সেই ভ্যান থেকে হ্যাণ্ডবিল ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে, সেগুলো কাটা-ঘুড়ির মতন উড়ছে বাতাসে, জোজো জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা খপ করে ধরে নিল।

সার্কাসের বিজ্ঞাপন! এখানে জুয়েল সার্কাস চলছে। দিনে দু'বার, দুপুর তিনটে আর সন্ধে সাড়ে ছ'টায়।

জোজো পড়তে-পড়তে বলে উঠল, “কাকাবাবু, আমরা সার্কাস দেখব! অনেকদিন দেখিনি!”

কাকাবাবু বললেন, “তা দেখা যেতে পারে। মফস্বলের সার্কাস দেখতে বেশ মজা লাগে।”

একটুখানি যাওয়ার পর মাঠের মধ্যে সেই সার্কাসের তাঁবুও দেখা গেল। বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। সামনে একটা হাতি বাঁধা আছে। এখানেও একজন লোক চ্যাঁচাচ্ছে।

সন্তু বলল, “পাঁচটা বাঘ, তার ওপর হাতিও আছে, দারুণ জমবে মনে হচ্ছে।”

নামখানায় নদীর ধারে কয়েকটা চায়ের দোকান রয়েছে। কাকাবাবু একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামালেন। গাড়ি থেকে না নেমেই তিনি তিনটে চা ও বিস্কুট দিতে বললেন দোকানদারকে।

নদীটা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু অনেক বড়-বড় নৌকো যায়। একটা ফেরি চলছে, ইচ্ছে করলে গাড়িসুদ্ধুও ওপারে যাওয়া যেতে

পারে। একটা খড় বোঝাই নৌকোর ওপরে বসে একটি লোক চেঁচিয়ে গান গাইছে। একটা মাছধরা নৌকো থেকে জেলেরা দু' ঝুড়ি মাছ নীচে নামিয়ে আনল।

রাস্তার উলটোদিকে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, তার ভেতরে বসা একজন লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে। একটু পরে লোকটি নেমে এদিকে এল।

কাছে এসে সে বলল, "তা হলে চোখে ভুল দেখিনি। রাজা রায়চৌধুরী ? ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "অসীম দত্ত। অনেকদিন পর দেখা। তোমার কী বিশ্বাস হচ্ছিল না ?"

অসীম দত্ত বললেন, "পা ঠিক হয়ে গেছে ? কী করে হল ? কবে হল ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ভাঙা পা কি আর জোড়া লাগে ? এই দ্যাখো না, ক্রাচ দুটো পাশে রাখা আছে।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই তো গাড়ি চালাচ্ছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "এইটুকু প্রোমোশন পেয়েছি। নতুন ধরনের জুতো পেয়েছি দিল্লিতে, গাড়ি চালাতে পারি, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারি না। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতেও পারি না। তুমি এ দিকে কোথায় এসেছিলে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "এখানে একটা সুন্দর বাংলো আছে। ছুটি নিয়ে দিন তিনেক কাটাতে এসেছিলাম। আজ ফিরে যাচ্ছি। তুমি কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছ নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, রহস্য-টহস্য কিছু নেই। অনেকদিন পর গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস করছি।"

সন্তু আর জোজোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "অসীম আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এখন পুলিশের একজন

বড়কর্তা।"

অসীম দত্ত পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বললেন, "রাজা, এটা রাখো। কখনও দরকার হলে ফোন কোরো। তোমার বাড়িতে আমি একদিন যাব। আমার মেয়ে তোমার খুব ভক্ত। সে অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসেনি এবার।"

আর একটুক্ষণ কথা বলে অসীম দত্ত চলে গেলেন। সন্তু আর জোজো গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

সন্তু বলল, "জোজো, চল ফেরিতে চেপে ওপারটা ঘুরে আসি।"

জোজো উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, "ওপারে দেখবার কী আছে ? আমার ভাই খিদে পেয়ে গেছে। তা ছাড়া সার্কাস যদি আরম্ভ হয়ে যায় ?"

আবার ফিরে আসা হল কাকদ্বীপের সেই হোটেলে। এখন ভেতরে বেশ ভিড়। ফাঁকা টেবিল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হল খানিকক্ষণ। জোজোর মুখ দেখে মনে হয়, সে আর খিদে সহ্য করতে পারছে না। টেবিলে বসার পর বেয়ারা প্রথমেই একটা প্লেটে লেবু, লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে গেল, জোজো শুধু-শুধু সেই পেঁয়াজই খাওয়া শুরু করে দিল।

এ-হোটেলের খাবার এখনও বেশ ভাল আছে। সবকিছুই গরম-গরম। ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, পার্শে মাছ ভাজা, এর পর কাকাবাবু নিলেন বড়-বড় ট্যাংরা মাছের ঝোল। সন্তু সেই মাছের বদলে নিল মুর্গির মাংস, জোজো মুর্গির মাংসও নিল, সেইসঙ্গে দু'পিস ইলিশ মাছ। সেই ইলিশের ঝোল এমনই ঝাল যে, ঠোঁট দিয়ে হুস-হুস শব্দ করতে লাগল জোজো।

কাকাবাবু বললেন, "এর পর দই খাও, ঝাল কমে যাবে।"

এ-হোটেলে দই পাওয়া যায় না। তারা আনিয়ে দিল অন্য

দোকান থেকে।

দই শেষ করার পর কাকাবাবু বললেন, "আঃ, বড় তৃপ্তি হল।"

সন্তু বলল, "বেশি খেয়ে ফেলেছি। সার্কাস দেখতে গিয়ে ঘুম না পেয়ে যায়!"

জোজো বলল, "আমি চিমটি কেটে তোকে জাগিয়ে দেব!"

সার্কাস শুরু হতে এখনও কিছুটা দেরি আছে, কিছু-কিছু লোক আসছে এর মধ্যে। এখন মাইকে একটা গান বাজছে, আর হঠাৎ হঠাৎ সেই গান থামিয়ে একজন লোক ঘোষণা করছে, "আসুন, আসুন, খেলা শুরু হবে, ক্ষণে-ক্ষণে শিহরন, আগুনে ঝাঁপ দেবে মেয়ে, মাথার একটি চুলও পুড়বে না। কাটা মুণ্ডু কথা বলবে, চোখের পলকে জীবন্ত মানুষ অদৃশ্য, বাঘের মুখে বাঙালি, তবলার তালে-তালে হাতির নাচ..."

কাকাবাবু বেশি দামের তিনখানা টিকিট কিনে ফেললেন। ভেতরে অনেকটা বড় জায়গা, থাক-থাক গ্যালারি করা, সামনের দিকে কিছু গদি-মোড়া চেয়ার। দুটি ক্লাউন ডিগবাজি খাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাদের কালো রঙের পোশাক, মুখ এমনই সাদা যে, মনে হয় চুন মেখেছে। পরদার আড়াল থেকে ভ্যাঁপ্পোর পোঁ, ভ্যাঁপ্পোর পোঁ করে একটা বাজনা বাজছে।

ঠিক তিনটের সময় পরদা খুলে গেল। নানারকম সাজপোশাক পরা খেলোয়াড়রা বেরিয়ে এসে দৌড়তে লাগল গোল হয়ে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়েও রয়েছে।

প্রথমে আরম্ভ হল ট্রাপিজের খেলা। অনেক ওপরে রয়েছে দুটো দোলনা। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এক দোলনা থেকে লাফিয়ে যাচ্ছে অন্য দোলনায়। সেই খেলাই চলল বেশ কিছুক্ষণ। লোকে উসখুস করছে, অনেকেরই এ-খেলা ভাল লাগছে না। একজন চেঁচিয়ে উঠল, "কই দাদা, বাঘ কখন

আসবে?"

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "এই ট্রাপিজের খেলা খুব শক্ত। দ্যাখ, নীচে জাল পেতে রাখেনি। পড়ে গেলে হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাবে।"

তাঁবুর পেছন দিক থেকে দু'বার বাঘের ডাক শোনা গেল।

জোজো বলল, "আসল বাঘের ডাক নয়। হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে কোনও মানুষ এরকম আওয়াজ করছে।"

সন্তু বলল, "বাঘের খেলার সময় মানুষই কি বাঘ সেজে আসবে?"

সোনালি রঙের কোট পরা একজন লোক এসে মাঝখানে দাঁড়াল, বুকের কাছে অনেক মেডেল ঝোলানো। সে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, আমরা পরপর কী খেলা দেখাব, তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। জন্তু-জানোয়ারের খেলা একেবারে শেষকালে দেখানো হয়। তার আগে আপনারা দেখবেন অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ সব খেলা, জীবন্ত মানুষ অদৃশ্য, মোটর সাইকেলের মরণঝাঁপ, কাটা মুণ্ডুর কথা বলা..."

সেই লোকটির কথা শেষ হতে-না-হতেই একটা মোটর সাইকেলের দারুণ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আর সব আলো নিভিয়ে একদিকে ফোকাস ফেলতে দেখা গেল, খানিকটা উঁচুতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মোড়া একজন লোক বসে আছে মোটর সাইকেলে। পেছন থেকে খুব জোরে-জোরে দু'বার ড্রাম বাজতেই সে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল। প্রথমে মনে হল, সে শূন্যের ওপর দিয়ে মোটর সাইকেলটা চালাচ্ছে। আসলে তা নয়। সেখানে একটা মোটা তার টাঙানো আছে। মোটর সাইকেল যাচ্ছে সেই তারের ওপর দিয়ে।

দু'বার সেই তারের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার পর সেই লোকটি আরও সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। মোটর সাইকেল সমেত সে সেই তার থেকে ঝাঁপ দিল নীচের দিকে। ততক্ষণে নীচের জায়গাটায় দু'জন লোক একটা গোরুর গাড়ির চাকার সমান রিং নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই রিংটার মাঝখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। মোটর সাইকেল-আরোহী ওপর থেকে পড়ে সেই আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দারুণ খেলা। সবাই চটাপট হাততালি দিল।

কাকাবাবু বললেন, "কী করে পারে ? কতদিন প্র্যাকটিস করতে হয় বলো তো !"

এর পর কয়েকটা খেলা এমন কিছু নয়। অতি সাধারণ। কাটা মুণ্ডুর কথা বলা দেখলে হাসি পায়। প্রথমে সত্যি মনে হয়, একটি মেয়ের শুধু মুণ্ডুটা শূন্যে ঝুলছে। সেটা আবার একপাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে। আসলে আর সব আলো নিভিয়ে ফোকাস ফেলা হয়েছে শুধু মেয়েটির মুখে, তার শরীরটা কালো কাপড়ে ঢাকা। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে শুধু মুখটা। সেই মুখ আবার নাকিসুরে কথা বলছে।

সেই খেলার পর আবার সব আলো জ্বলে উঠল। এবারে স্টেজের ওপরে এসে দাঁড়াল আর-একজন লোক। এরও কালো পোশাক, মুখে একটা মুখোশ, হাতে একটা মস্ত বড় চাদর। প্রথমে লোকটি সেই চাদরটা নিয়ে খানিকটা নাচ দেখাল। তারপর সে থামতেই আগের সোনালি কোট পরা লোকটি এসে বলল, "এবার জাদুকর এক্স আপনাদের মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাবেন। ইনি সবকিছু অদৃশ্য করে দিতে পারেন। আলো জ্বলবে, আপনাদের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে! প্রথমে দেখুন একটা কুমড়ো !"

একটা বিরাট কুমড়ো এনে রাখা হল একটা টুলের ওপর। জাদুকর এক্স সেই কুমড়োটার গায়ে হাত বুলিয়ে টুলটার চারপাশে ঘুরলেন একবার। তারপর সেই কালো চাদরটা দিয়ে কুমড়োটাকে একবার ঢেকেই তুলে নিলেন। কুমড়োটা আর নেই!

এর পর জাদুকর এক্স সেই টুলটাকে ওইভাবে অদৃশ্য করে দিলেন।

দড়ি বেঁধে একটা ছাগলকে টানতে-টানতে আনা হল মঞ্চে, সেটা ব্যা-ব্যা করে ডাকছে। কালো কাপড়ে ঢাকার পর ছাগলটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালো কাপড়টা রাখা হচ্ছে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জাদুকর এক্স নিজে কোনও কথা বলছেন না, শুধু একবার নাচের ভঙ্গিতে ঘুরছেন।

সোনালি কোট পরা লোকটি বলল, "এবার মানুষ ! যে-কোনও মানুষ, ছোট-বড়, নারী-শিশু, মোটা-রোগা, যে-কোনও মানুষকে দেখবেন, এই আছে, এই নেই !"

একজন মাঝবয়েসী লোক এসে দাঁড়াল মঞ্চে। জাদুকর এক্স সঙ্গে-সঙ্গে তাকে অদৃশ্য না করে কালো কাপড়টা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নাচতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, মানুষ কি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হতে পারে ?"

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না !"

জোজো বলল, "আমি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'অদৃশ্য মানুষ' নামে একটা বই পড়েছি। 'স্টার ট্রেক' সিরিয়ালে দেখায় একটা যন্ত্রের নীচে দাঁড়ালে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার আগের চেহারায় ফিরে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো কল্পনা। সত্যি-সত্যি ওরকম হতে

পারে না। এ-পর্যন্ত বিজ্ঞান যতখানি এগিয়েছে, তাতে সম্ভব নয়!"

জোজো তবু অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তা হলে এই লোকটা কী করে করছে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও একটা কায়দায় আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে। কায়দাটা জানলে তো আমি নিজেই এরকম দেখাতে পারতাম। ম্যাজিশিয়ান কতরকম খেলা দেখায়, আমরা ধরতেই পারি না।"

মঞ্চের লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর সোনালি কোট পরা লোকটি দর্শকদের দিকে চেয়ে বলল, "দেখলেন? দেখলেন? বিশ্বাস হল তো? যদি কেউ অবিশ্বাস করে থাকেন, তিনি উঠে আসুন। তাঁকেও অদৃশ্য করে দেওয়া হবে। আসুন, আসুন, কে আসবেন, আসুন।"

জোজো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি যাব। আমি কায়দাটা দেখতে চাই।"

জোজোর সঙ্গে-সঙ্গে আরও চারজন গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চে।

সোনালি কোট বলল, "সবাইকে তো অদৃশ্য করা যাবে না। আমাদের এর পরে অন্য খেলা আছে। মাত্র একজন। একজনকে বেছে নেওয়া হবে।"

পাঁচজন নানা বয়েসের। ম্যাজিশিয়ান এক্স সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে জোজোর দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কেন যে তিনি জোজোকে বেশি পছন্দ করলেন, তা বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে জোজোর কাঁধে হাত রাখলেন।

অন্য চারজন ফিরে এল। জোজোকে দাঁড় করানো হল স্টেজের মাঝখানে। জোজো মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছে, তবু মনে হচ্ছে যেন সে একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। সোনালি কোট

আরও খানিকক্ষণ বকবক করল। তারপর ম্যাজিশিয়ান কালো চাদরটা উড়িয়ে জোজোর পাশ দিয়ে নাচলেন একবার। দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে কালো চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিলেন, আবার সরিয়েও নিলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

জোজো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সবাই খুব জোরে-জোরে হাততালি দিল একবার।

পরের খেলাগুলো তেমন কিছু জমজমাট নয়। পাঁচটা বাঘ একসঙ্গে দেখা যায়নি, দুটো বাঘকেই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আনা হয়েছে, অন্য নাম দিয়ে। সে বাঘ দুটোও রোগা আর বুড়ো, মনে হয় আফিং খাইয়ে রাখা হয়েছে, আস্তে-আস্তে হাঁটে। হাতির নাচটা মোটেই নাচ নয়। হাতিটাকে নিয়ে আসার পর পেছন থেকে এত জোরে-জোরে ঢাক-ঢোল-জগঝম্প বাজানো হতে লাগল যে, মনে হল যেন হাতিটা ভয় পেয়ে দৌড়চ্ছে। একজন লোক তাকে গোল করে ঘোরাতে লাগল।

সন্তু মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে দেখছে যে জোজো ফিরে আসছে কি না। কিন্তু একটার পর একটা খেলা হয়ে যাচ্ছে, জোজোর দেখা নেই।

ক্লাউন দু'জনের কাণ্ডকারখানাই বেশ মজার। একবার একজন ক্লাউন একটা জ্বলন্ত সিগারেট পুরোটাই মুখের মধ্যে ভরে দিল, তারপর তার মুখ থেকে আগুন বেরোতে লাগল ভলকে-ভলকে। অন্য ক্লাউনটি এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল তার মাথায়, তখন

তার চুল থেকেও বেরোতে লাগল ধোঁয়া। বালতিতে আর জল নেই। অন্য ক্লাউনটি তখন মুখ থেকে পিচকিরির মতন জল বার করতে লাগল।

এই খেলাটা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠলেন।

সব খেলা শেষ হওয়ার পর দর্শকরা উঠে চলে যেতে লাগল, কাকাবাবু আর সন্তু দাঁড়িয়ে রইল জোজোর জন্য। জোজো আসছে না। সব লোক বেরিয়ে গেল তবু পাত্তা নেই জোজোর।

কাকাবাবু হাসিমুখে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, আমাদের জোজোবাবু কি সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি ?

সন্তু বলল, "ও বোধ হয় এখনও ম্যাজিশিয়ানের কাছ থেকে কায়দাটা শিখছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল দেখে আসি, কতটা শিখল।"

যেখানে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে এসে কাকাবাবু পেছনের পরদাটা সরিয়ে ফেললেন। যারা খেলা দেখাল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সেখানে বসে শিঙাড়া আর চা খাচ্ছে। সোনালি কোট পরা লোকটি মনে হয় এই সার্কাসের ম্যানেজার। তার হাতেই শিঙাড়ার ঝুড়ি। জাদুকর এক্স একটা টিনের চেয়ারে বসে আছেন, সামনের দিকে পা দুটো ছড়ানো। মুখোশটা এখনও খোলেননি, একটা চুরুট টানছেন আপনমনে। তাঁর পাশে একজন লোক একটা লম্বা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা আলো ঠিক করছে।

কাকাবাবু সেই সোনালি কোট পরা ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও মশাই, আপনাদের খেলা তো শেষ হয়ে গেল, এবার আমাদের ছেলেটিকে ফেরত দেবেন না ?"

ম্যানেজার বললেন, "আপনাদের ছেলে মানে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই যাকে অদৃশ্য করে দিলেন ? আর

কতক্ষণ অদৃশ্য করে রাখবেন ?"

ম্যানেজার একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সে তো চলে গেছে !"

কাকাবাবু বললেন, "চলে গেছে ? কখন গেল ?"

ম্যানেজার বললেন, "কখন ? তাকে চারটে শিঙাড়া আর দুটো রসগোল্লা দেওয়া হয়েছিল, সব খেয়ে নিল, তারপর নিজেই চলে গেছে।"

সন্তু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই বাইরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও কাকাবাবু আবার মুখ ফিরিয়ে ম্যাজিশিয়ান এক্স-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এই অদৃশ্য করার কায়দাটা কী বলুন তো !"

উত্তর না দিয়ে ম্যাজিশিয়ান কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখোশের আড়ালে তাঁর মুখখানা কেমন তা বোঝার উপায় নেই। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আপনার খেলাটা আমাদের খুব তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আপনার শো-ম্যানশিপ চমৎকার।"

ম্যাজিশিয়ান এবার শুধু বললেন, "থ্যাঙ্কস !"

ম্যানেজার হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন, "আমাদের কায়দাগুলো ফাঁস করে দিলে কি চলে ? তা হলে আর লোকে টিকিট কেটে দেখতে আসবে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বটে, তা বটে! আমি এমনই কৌতূহলে জিজ্ঞেস করছিলাম। চল সন্তু—"

এই সময় টুলের ওপর দাঁড়ানো লোকটি হঠাৎ হুড়মুড় করে টুল উলটে পড়ে গেল। একেবারে সন্তুর গায়ের ওপর। দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি।

ম্যানেজার হা-হা করে ছুটে এসে সন্তুকে ধরে তুলতে-তুলতে বললেন, "লাগেনি তো ভাই ? লাগেনি তো ?"

সন্তুর কিছুই হয়নি, কিন্তু অন্য লোকটির মাথা ঠুকে গেছে। সন্তুই তাকে তুলতে গেল। লোকটির বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথায় একটাও চুল নেই, মুখে গোঁফ-দাড়ির কোনও চিহ্ন নেই, এমনকী ভুরু দুটোও প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।

ম্যাজিশিয়ান চেয়ার থেকে ঝুঁকে সেই লোকটির গালে জোরে একটা চড় কষিয়ে বললেন, "ইউ ফুল !"

ম্যানেজার বললেন, "আহা-হা, ওকে মারছেন কেন ? বেচারা পা পিছলে পড়ে গেছে। ক্ষতি তো কিছু হয়নি।"

পড়ে যাওয়ার সময়, কিংবা চড় খেয়েও সেই লোকটা মুখ দিয়ে একটা শব্দও করেনি।

কাকাবাবু আর সন্তু বেরিয়ে এল তাঁবুর পেছন দিক থেকে। একপাশে বাঘের খাঁচা। একটু দূরে সেই ছাগলটাও বাঁধা রয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ম্যাজিশিয়ান এক্স-এর মুখে মুখোশ কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যাজিশিয়ানদের নানারকম সাজপোশাক করতে হয়। ইনি মুখোশ লাগিয়েছেন। মুখোশ লাগালে অন্য গ্রহের প্রাণী মনে হয় না ?"

সন্তু বলল, "খেলা দেখাবার পরেও মুখোশ খোলে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সাড়ে ছ'টার সময় তো আবার শো শুরু হবে, তাই খোলেনি বোধ হয়।"

বাইরে কোথাও জোজোকে দেখা গেল না। গাড়ির কাছেও সে নেই।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোটা কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে।

আমাদের কাছে প্রমাণ করবে যে ও সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এর পর এসে যে কত গল্প বানাবে ! ও অদৃশ্য হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে, এর মধ্যে হিমালয় ঘুরে এসেছে, কিংবা সমুদ্রের তলায়..."

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর গল্প শুনতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু কতক্ষণে সে দেখা দেবে ? সন্ধে হয়ে গেল যে, ফিরতে হবে না ?"

শীতকালের বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়ে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। গাড়ির কাছে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও জোজোর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন পরে গাড়ি চালাচ্ছি, রাত্তিরবেলা অসুবিধে হতে পারে। তুই দেখে আয় তো, ওই তাঁবুর আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে কি না। এখানে মাঠের মধ্যে কোথায় লুকোবে ?"

সন্তু দৌড়ে দেখে এল। সেখানে কোথাও জোজো নেই। সার্কাসের লোকেরাও কেউ কিছু বলতে পারে না।

ফিরে এসে সন্তু বলল, "ও সহজে দেখা দেবে না। এক কাজ করা যাক। তুমি গাড়িতে স্টার্ট দাও। আমাদের চলে যেতে দেখলেই দৌড়ে আসবে।"

সন্তু উঠে বসল, কাকাবাবু গাড়ি চালাতে শুরু করলেন, বড় রাস্তা ধরে গেলেন খানিকটা। জোজো তবু দৌড়ে এল না।

সন্তু বলল, "বেশি গল্প বানাবার জন্য জোজো বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকবে। হয়তো ডায়মন্ড হারবার চলে গেছে বাসে চেপে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে। আমাদের দেখলে বলবে, অদৃশ্য হয়ে উড়ে ডায়মন্ড হারবার পৌঁছে গেছে।"

তবু কাকদ্বীপের কয়েকটা দোকানে উঁকি দিয়ে জোজোকে খুঁজে

দেখা হল। তার কোনও চিহ্ন নেই। অগত্যা গাড়ি ছুটল ডায়মন্ড হারবারের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর প্র্যাকটিক্যাল জোক একটু বেশি-বেশি হয়ে যাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারে অত ভিড়ের মধ্যে কোথায় তাকে খুঁজব?"

সন্তু বলল, "ও নিশ্চয়ই রাস্তার ধারে বসে থাকবে। আমাদের গাড়ি দেখলেই চিনবে।"

ডায়মন্ড হারবারের কাছাকাছি এসে কাকাবাবু গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন। এখন অবশ্য তেমন ভিড় নেই। যারা পিকনিক করতে এসেছিল, প্রায় সবাই ফিরে গেছে। তা ছাড়া বেশ শীত পড়েছে, গঙ্গার ধারে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না।

আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে কাকাবাবু পুরো শহরটা অতিক্রম করে গেলেন। আবার ফিরে এলেন 'সাগরিকা' হোটেলের কাছে। আবার উলটো দিকে গাড়ি ঘোরালেন। কোথায় জোজো?

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে কি জোজো কাকদ্বীপেই থেকে গেল?"

সন্তু বলল, "বরং আমার মনে হয়, জোজো কলকাতায় ফিরে গেছে। এখান থেকে ট্রেন আছে, বাস আছে।"

কাকাবাবু সাধারণত রাগ করেন না। কিন্তু এখন বিরক্তিতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি আপনমনে বললেন, "এটা জোজো ঠিক করেনি। এতক্ষণ লুকিয়ে থাকার কী মানে হয়? শুধু-শুধু আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলা।"

সন্তু বলল, "জোজো ঠিক কলকাতায় চলে যেতে পারবে। বাস আছে, ট্রেন আছে। ওর কাছে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, আমি দেখেছি।"

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলকাতায় ফিরতেই হল। আগে সন্তুদের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে ফোন করল সন্তু।

জোজোর মা ধরেছেন, সন্তু বলল, "মাসিমা, একটু জোজোকে দিন তো।"

জোজোর মা বললেন, "জোজো তো নেই। ও তো সকালবেলা তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়েছিল। এখনও ফেরেনি। তোমাদের সঙ্গে ফেরেনি?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিল, কিন্তু ওখানে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ও তার সঙ্গে ফিরবে বলল...নিশ্চয়ই এসে যাবে খানিকক্ষণ পরে—"

রাত্তির দশটা, এগারোটা, বারোটা, তিনবার ফোন করল সন্তু, তারপর সারারাত কেটে গেল। পরদিন সকাল দশটার মধ্যেও জোজো ফিরল না, নিজের বাড়িতে সে কোনও খবরও দেয়নি।

কাকাবাবু বললেন, "ছি ছি ছি ছি। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেল, অথচ আমরা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। ওর মা-বাবা কী ভাবছেন আমাদের!"

সন্তু বলল, "জোজোর বাবা কলকাতায় নেই, কাশী গেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর মা একলা রয়েছেন? ছেলের জন্য উনি ব্যাকুল হয়ে পড়বেন।"

সন্তু বলল, "না, একলা নন মাসিমা। জোজোদের বাড়িতে অনেক লোক।"

সন্তু এখনও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে পারছে না। তার দৃঢ় ধারণা, জোজো নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে। তার মনে পড়ল, কাকাবাবু দিল্লিতে আছেন শুনে জোজো বলেছিল, "কাকাবাবুকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে, জোজো মিসিং! তা হলেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসবেন। আমি লুকিয়ে

থাকব, কাকাবাবু আমাকে খুঁজে বার করবেন। বেশ মজা হবে!” জোজো নিশ্চয়ই এই খেলাটাই খেলছে।

কিন্তু নিজের মাকেও যে দারুণ চিন্তায় ফেলে দিল জোজো? তিনি বারবার ফোন করছেন উতলা হয়ে। আর একবার ফোন করতেই সন্তুকে বাধ্য হয়ে একটা ছোট্ট মিথ্যে কথা বলতে হল।

সন্তু বলল, “মাসিমা, কাল তো জোজোর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই জোজোকে জোর করে ধরে রেখেছে। এখন আমাদের কলেজ ছুটি, তাই জোজো থেকে গেছে। দু'-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে।”

এ-কথা বলে তো দিল, কিন্তু জোজো যদি দু'-একদিনের মধ্যেও না ফেরে? যদি তার সত্যিই কোনও বিপদ হয়ে থাকে? তখন সবাই বলবে, আগেই কেন পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি।

এখন পুলিশে খবর দিলে তারা প্রথমেই ভাল করে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জোজোদের বাড়িতে যাবে। তাতে জোজোর মা আরও ব্যাকুল হয়ে পড়বেন না? নিশ্চয়ই কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন!

কী মুশকিলেই ফেলে দিল জোজো!

অসীম দত্ত কাকাবাবুকে একটা কার্ড দিয়েছিলেন। কাকাবাবু সেই কার্ড দেখে অফিসে ফোন করলেন। সেখান থেকে জানানো হল, তিনি অফিসে আসেননি, বাড়িতেই আছেন। বাড়িতে ফোন করার পর একটি মেয়ে বলল, অসীম দত্ত বাড়িতেও নেই, মাংস কিনে আনতে গেছেন, খানিক বাদেই ফিরবেন।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি অসীমের মেয়ে? তোমার নাম কী?”

মেয়েটি বলল, “আমার নাম রূপকথা, ডাকনাম অলি।”

কাকাবাবু বললেন, “শোনো অলি, আমার নাম রাজা

রায়চৌধুরী, তোমার বাবাকে বাড়িতে থাকতে বলো, আমি এক্ষুনি আসছি।”

কাকাবাবুর নাম শুনে অলি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু ফোন রেখে দিলেন। সন্তুকে বললেন, “তৈরি হয়ে নে। মাকে বলে যা, রাত্রে আমরা নাও ফিরতে পারি।”

আজ আর কাকাবাবু গাড়ি নিলেন না। একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এলেন আলিপুরে অসীম দত্তর বাড়িতে।

দরজা খুলে অসীম দত্ত সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, “আমি তোমার বাড়িতে যাব বলেছিলাম, তার আগে তুমিই চলে এলে? দ্যাখো, আমার মেয়ে কী কাণ্ড করেছে!”

বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, একগাদা নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। টেবিলের ওপর দু'খানা ফুলদানি ভর্তি ফুল, এক জন লোক ক্যামেরা তুলে খচাত-খচাত করে ছবি তুলতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, “এ কী!”

অসীম দত্ত বললেন, “আমার মেয়ে তোমার কী দারুণ ভক্ত, তুমি জানো না! কতবার বলেছে, তোমাকে দেখতে যাবে। আজ তুমি নিজেই আসছ শুনে পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে ডেকে এনেছে।”

অলির বয়েস তো তেরো-চোদ্দো বছর, একটা গোলাপি রঙের ফ্রক পরে আছে। সে একটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল কাকাবাবুর গলায়। তারপর কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল।

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “থাক, থাক!”

একজন মহিলা বললেন, “সন্তু কোথায় গেল? সে এসেছে?”

অসীম দত্ত সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, “আরে, তুমি পেছনে লুকিয়ে আছ কেন? সামনে এসো—”

সেই মহিলাটি বললেন, "ও মা, সত্যি-সত্যি সন্তু নামে কেউ আছে ? এ তো দারুণ ছেলে, কাকাবাবুর চেয়ে কম যায় না।"

অলি একটা ফুলের তোড়া তুলে দিল সন্তুর হাতে। সন্তু লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

ওদের দু'জনকে বসানো হল দুটি চেয়ারে। অনেকে বলতে লাগল, আমরা সন্তু আর কাকাবাবুর সঙ্গে ছবি তুলব !

এক-একজন পাশে এসে দাঁড়ায়, ক্যামেরাম্যানটি ছবি তোলে। এরই মধ্যে অনেকে মিলে কাকাবাবুকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল, রাজা কনিষ্কর মুণ্ডু আবার খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, তার কি ছবি তোলা আছে ? মাউন্ট এভারেস্টে যাওয়ার পথে কি সত্যিই ইয়েতি দেখা গিয়েছিল ? আন্দামানের জারোয়ারা এখনও বিষাক্ত তীর ছোড়ে ?

কাকাবাবু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর হাত তুলে বললেন, "আজ এই পর্যন্ত থাক। অসীমের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

অসীম দত্ত সবাইকে বললেন, "ছবি তোলা তো হয়েছে, এবার আপনারা একটু পাশের ঘরে যান।"

ঘর খালি হয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু গলা থেকে মালা খুলে ফেলতে লাগলেন। অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি কিছু জরুরি কথা আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি। কাল আমার সঙ্গে দু'জনকে দেখেছিলে তো ? আমার ভাইপো সন্তুর সঙ্গে ওর বন্ধু জোজোও ছিল। সেই জোজোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে ? কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে আমাদের সঙ্গে কাল ফেরেনি। আমরা কাকদ্বীপে একটা সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। একটা লোক মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাচ্ছিল, জোজো নিজেই এগিয়ে গেল, ম্যাজিশিয়ানটা কীসব কায়দা-টায়দা করল, তারপর, মানে, তারপর জোজো আর নেই !"

অসীম দত্ত ঠাট্টার সুরে বললেন, "বলো কী ! জলজ্যান্ত ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল ? একেবারে মিলিয়ে গেল হাওয়ায় ?"

কাকাবাবু বিব্রতভাবে বললেন, "শুনলে সবাই মনে করবে গাঁজাখুরি ব্যাপার। কিন্তু ওই খেলার পর জোজোকে আর আমরা দেখিনি, এটাও ঠিক।"

সন্তু এবার বলল, "ওই খেলার পর জোজো শিঙাড়া আর রসগোল্লা খেয়েছিল, ম্যানেজার বলেছেন। অদৃশ্য হয়ে থাকলে কি কিছু খাওয়া যায় ?"

অসীম দত্ত আরও মজা করে বললেন, "সেও তো একটা প্রশ্ন বটে। অদৃশ্য হলে কি খেতে পারে ? ভূতেরা কি কিছু খায় !"

কাকাবাবু এবার গলায় জোর এনে বললেন, "ইয়ার্কি রাখো তো ! ছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কোনও বিপদ হতে পারে তো ! যদি তাকে কেউ জোর করে আটকে রেখে থাকে ?"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "জোজোর বয়েস কত ?"

কাকাবাবু বললেন, "ষোলো-সতেরো হবে !"

সন্তু বলল, "সতেরো। আমার সমান।"

অসীম দত্ত বললেন, "ওই বয়েসের ছেলেদের ধরে রাখা খুব শক্ত। কী সন্তু, তোমায় কেউ কোথাও আটকে রাখতে পারবে ?"

সন্তু মাথা নিচু করে হাসল। অনেকবারই কাকাবাবুর শত্রুরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেনি।

অসীম দত্ত বললেন, "ঠিক আছে। কাকদ্বীপ থানায় খবর পাঠাচ্ছি, ওরা খোঁজখবর নেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ওই কাকদ্বীপ থানার ওপর ভরসা করে কতদিন বসে থাকব ? আমার নিজেরই খুব লজ্জা লাগছে। ছেলেটা আমার সঙ্গে গেল, অথচ আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না ! আজই একটা কিছু করা দরকার। অসীম, তোমার কার্ডে দেখলাম, তুমি এখন আই জি ক্রাইম, তার মানে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তোমার কাজ। তুমি আমার সঙ্গে চলো কাকদ্বীপ। ওই সার্কাসে গিয়ে আবার খোঁজ নিতে হবে !"

অসীম দত্ত প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "কালই ওদিক থেকে ফিরেছি, আবার আজ যাব ? অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, দেখবে হয়তো বিকেলের মধ্যেই ছেলেটা বাড়ি ফিরে আসবে ! শোনো, রাজা, আজ পার্ক সার্কাস থেকে ভাল খাসির মাংস কিনে এনেছি। আমার রান্নার শখ আছে জানো তো ? নিজে আজ বিরিয়ানি রান্না করব। দুপুরে এখানে খাওয়াদাওয়া করো, বিশ্রাম নাও, তারপর বিকেলবেলা ফোন-টোন করে—"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল, সন্তু !"

অসীম দত্ত বললেন, "এ কী, তুমি রাগ করলে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বিরিয়ানি তুমি খাও। যত ইচ্ছে খাও ! আমি আর সন্তু এক্ষুনি কাকদ্বীপের দিকে রওনা হব।"

অমল দত্ত বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ঠিক আছে, যদি যেতেই চাও, আমি ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা অফিসারকে ফোন করে দিচ্ছি। ওর নাম অর্ক মজুমদার, খুব ভাল ছেলে। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই স্মার্ট। সে তোমাদের সাহায্য করবে।"

অসীম দত্ত টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। এই সময়

একজন কাজের লোক একটা ট্রে-তে করে একগাদা কচুরি-আলুর দম আর মিষ্টি নিয়ে এল, তার পেছনে-পেছনে এল অলি। তার মুখে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব।

অলি জিজ্ঞেস করল, "জোজো হারিয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন।

অলি বলল, "জোজোকে হাত-পা বেঁধে রেখেছে। মুখও বেঁধেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? কে বেঁধে রেখেছে ?"

অলি বলল, "তা জানি না। যেই শুনলাম যে জোজোকে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনই আমি দেখতে পেলাম, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে জোজো শুয়ে আছে। হাত-পা-মুখ সব বাঁধা !"

অসীম দত্ত অলির মাথায় হাত রেখে বললেন, "জানো তো রাজা, আমার মেয়ের এই একটা রোগ আছে। দিনের বেলা জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখে। কত কী-ই যে বলে, তার দু'-একটা মিলেও যায়। মেয়েটা একটু-একটু পাগলি !"

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে অলির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর কথা কীরকম মিলে গেছে শুনি ? একটা উদাহরণ দাও !"

অসীম দত্ত বললেন, "ও বানিয়ে-বানিয়ে অনেক কথা বলে, বেশিরভাগই মেলে না। তবে, কয়েকদিন আগে হঠাৎ বলল, আজ পিসিমণি আসবে, খুব মজা হবে ! ওর পিসিমণি মানে আমার বোন মণিকা। সে দিল্লিতে থাকে, কলকাতায় আসার কোনও কথাই নেই, আমাদের কিছু জানায়নি। সেইজন্য আমরা অলির কথা বিশ্বাস করিনি। ও মা, সন্ধের সময় হঠাৎ মণিকা তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির। ওরা প্লেনে কাঠমণ্ডু যাচ্ছিল, সেখানে এমন কুয়াশা আর বৃষ্টি যে, প্লেন নামতেই পারল না, চলে এল

কলকাতায়। আবার পরদিন ছাড়বে। সেইজন্য মণিকাও রাতটা কাটাতে চলে এল এখানে। আমার পাগল মেয়েটা কী করে আগে থেকে টের পেয়ে গেল বলো তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা রোগও নয়, পাগলামিও নয়। কোনও-কোনও মানুষের এই ক্ষমতা থাকে। তারা দূরের জিনিস দেখতে পায়। দশ লক্ষ-কুড়ি লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের থাকে এই ক্ষমতা। সাধারণ মানুষের চেয়ে এদের অনুভূতি অনেক তীব্র হয়। একে বলে ই এস পি।"

তারপর তিনি অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই অন্ধকার ঘরটা কোথায় বলতে পারো ?"

দু'দিকে মাথা নেড়ে অলি বলল, "তা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আর দেরি করতে পারছি না। এইসব কিছু আমরা খাব না !"

অসীম দত্ত বললেন, "একটা করে মিষ্টি অন্তত খাও। সন্তু, তুমি খাও। ততক্ষণে আমি অর্ককে টেলিফোন করে জানিয়ে দিই।"

অলি কাকাবাবুকে বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।"

অসীম দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "তুই কোথায় যাবি ? সামনের সপ্তাহে তোর গানের পরীক্ষা। আমরা যখন গেলাম, তখন তুই গেলি না !"

অলি বলল, "আমি জোজোকে খুঁজতে যাব !"

অসীম দত্ত বললেন, "তুই এই কাকাবাবুটাকে ঠিক চিনিস না। জোজো যদি সত্যিই হারিয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা কেউ জোর করে ধরে রাখে, তা হলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যেখানেই হোক, কাকাবাবু ঠিক খুঁজে বার করবে। তাই না রাজা ?"

অলি ঘাড় নিচু করে বলল, "আমি কাকাবাবুর সঙ্গে থাকব !"

অসীম দত্ত দু' হাত ছড়িয়ে বললেন, "এই রে ! এ মেয়ে যদি একবার জেদ ধরে, তা হলে কিছুতেই তো একে বোঝানো যাবে না ! যদি জোর করে যেতে না দিই, তা হলে কাঁদবে, অনবরত কাঁদবে, ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, কিছু খাবে না, কোনও কথা শুনবে না। কী মুশকিলে ফেললে বলো তো রাজা !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে অলি চলুক আমাদের সঙ্গে।"

সঙ্গে-সঙ্গে অলির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অসীম দত্ত একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তার মানে, আজ আর কপালে বিরিয়ানি নেই। মাংসটা ফ্রিজে তুলে রাখতে হবে। আমাকেও যেতে হবে, না হলে ওর মা কিছুতেই ছাড়বে না। একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে তৈরি হয়ে আসছি।"

আজ আর জিপ নয়, অসীম দত্ত নিলেন একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি। এইরকম বড়-বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সবসময় একজন বডিগার্ড থাকে। সেই বডিগার্ড আর অসীম দত্ত বসলেন সামনে, পেছনে কাকাবাবু, সন্তু আর অলি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গাড়ি যখন বেহালা পার হয়ে গিয়ে অনেকটা ফাঁকা রাস্তায় পড়ল, তখন অসীম দত্ত বললেন, "সবাই এত গোমড়ামুখে রয়েছ কেন ? কাকদ্বীপ পৌঁছবার পরে কাজ শুরু হবে, তার আগে তো কিছু করার নেই। অলি, তুই বরং একটা গান ধর।"

অলি করুণভাবে বলল, "আমার এখন গান গাইতে ইচ্ছে করছে না।"

অসীম দত্ত বললেন, "পরীক্ষার আগে তোর প্র্যাকটিস হয়ে যেত।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী গান শিখছ অলি ?"

অলির বদলে তার বাবা উত্তর দিলেন, "ক্ল্যাসিকাল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমার মেয়ে বলে প্রশংসা করছি না। সত্যিই ওর গানের গলা বেশ ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "অলি, তুমি 'খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে', এই গানটা জানো ?"

অলি মাথা হেলিয়ে বলল, "জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যদি এ গানটা গাইতে গিয়ে সুর ভুল করি, তুমি ঠিক করে দেবে ?"

সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবু ওই গানটা 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'-এর সুরে গাওয়া শুরু করলেন, সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "এবার তুমি সুরটা ঠিক করে দাও !"

অলি আস্তে-আস্তে 'খরবায়ু বয় বেগে' গাইতে গেল, কিন্তু তারও সুর 'ধনধান্য পুষ্প ভরা'র মতো হয়ে গেল অনেকটা !

কাকাবাবু হেসে বললেন, "দেখেছ, নকল গান কীরকম আসল গান ভুলিয়ে দেয় ! আমি আর একটা গান গাইছি। দ্যাখো, এটা আগে শুনেছ কি না !

"শুনেছো কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ !
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।"

অসীম দত্ত বললেন, "এটা তো সুকুমার রায়ের লেখা। সুর

দিয়েছে কে ?"

সন্তু বলল, "এটা কাকাবাবুর খুব প্রিয় গান। কাকাবাবুই সুর দিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "নিজে সুর দেওয়ার কী সুবিধে বলো তো ? এক-একবার এক-এক সুরে গাওয়া যায়, কেউ বলতে পারবে না যে সুর ভুল হয়েছে !"

গান আর গল্প করতে-করতে ডায়মন্ড হারবার এসে গেল।

অসীম দত্ত বললেন, "অর্ক মজুমদারকে ডেকে নেওয়া যাক, কী বলো ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে খানিকটা দেরি হয়ে যাবে। আগে চলো কাকদ্বীপ ঘুরে আসি।"

গাড়ি থামল না, এগিয়ে চলল।

কাকাবাবু অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাল নাম রূপকথা, এমন সুন্দর নাম আগে শুনিনি। এ নাম কে রেখেছে ?"

অলি বলল, "ঠাকুমা।"

অসীম দত্ত বললেন, "আমার মা অনেক ছেলেমেয়েদের নাম দেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন কিংবা পাড়ার মধ্যে কারও ছেলে বা মেয়ে জন্মালেই সে মাকে নাম ঠিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। মা সব নতুন ধরনের নাম ভেবে বার করেন। ক'দিন আগে একটা ছেলের নাম রেখেছেন নির্ভয়।"

সন্তু বলল, "এই রে, যদি ছেলেটা পরে ভিতু হয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওইরকম নামের জন্যই সে ভিতু হতে পারবে না।"

অসীম দত্ত বললেন, "নামের সঙ্গে কি সকলের মিল থাকে ? যার নাম পদ্মলোচন, তার কি কখনও চোখ কানা হতে পারে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "রূপকথা নামটা কিন্তু অলিকে খুব

মানিয়েছে। আচ্ছা অলি, তুমি আর কী-কী দূরের জিনিস দেখেছ? যেমন তুমি জোজোকে একটা অন্ধকার ঘরে দেখতে পেলে?"

অলি বলল, "আমি মাঝে-মাঝে এরকম দেখি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই ভাবে, বানিয়ে-বানিয়ে বলছি।"

কাকাবাবু বললেন, "দু-একটা তো মিলেও যায়!"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি যদি কারও হাত দেখে দশটা কথা বলো, তা হলে একটা-দুটো মিলে যেতেই পারে!"

কাকাবাবু বললেন, "অলি, তোমার পিসিমণি আসবার মতন, তুমি আর কী বলেছ, যা মিলে গেছে?"

অলি বলল, "একদিন আমি ছাদের ঘরে বসে বই পড়ছি, হঠাৎ খুব জোর একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল, একটা মোটরসাইকেল খুব জোর ছুটে যাচ্ছে। খুব কাছে। রাস্তায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেখানে কোনও মোটরসাইকেল নেই। কেমন যেন ভয়-ভয় করল। তারপরই দেখতে পেলাম ছোটকাকাকে। তার মুখ দিয়ে ভলকে-ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে।"

থেমে গিয়ে, বাবার দিকে তাকিয়ে অলি আড়ষ্টভাবে বলল, "এ-কথাটা তোমাদের বলিনি। আমার এমন ভয় করছিল!"

অসীম দত্ত দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "তুই সত্যি এরকম দেখেছিলি? জানো রাজা, আমার ছোটভাই থাকে পটনায়। সে মোটরসাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছে। কয়েকটা পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর চারখানা দাঁত! আমরা খবর পেয়েছিলাম দু'দিন পরে। অলি তা আগে থেকে কী করে জানবে? অলি, তুই আগে বলিসনি, এখন বানাচ্ছিস না তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ও বানাচ্ছে না। ওর মুখ দেখেই

বোঝা যায়!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি তো জোজোকে কখনও দ্যাখোনি। তাকে চেনো না। তুমি কী করে বুঝলে, অন্ধকার ঘরে জোজোকে বেঁধে রাখা হয়েছে?"

অলি আমতা-আমতা করে বলল, "জোজোকে চিনি না...তোমরা যখন জোজোর কথা বলছিলে, তখন হঠাৎ দেখলাম...তোমারই বয়েসী একটা ছেলে, হাত বাঁধা, মুখ বাঁধা..."

অসীম দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, "এটা মিলবে না। আমার ধারণা, আজ বিকেলের মধ্যেই ছেলেটার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

গাড়িটা কাকদ্বীপ বাজার পেরিয়ে যেতেই সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে! তাঁবুটা কোথায়?"

সত্যিই মাঠের মধ্যে কাল বিরাট সার্কাসের তাঁবু ছিল, মাইকে অনবরত ঘোষণা হচ্ছিল, গান বাজছিল, এখন সব চুপচাপ, তাঁবুটাও নেই।

তবে, কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। ভারী-ভারী বাক্স বয়ে আনছে কিছু লোক। একটা খাঁচায় দুটো বাঘ, আর একটা খাঁচায় একটা বাঘ। হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। অত বড় হাতিকে কি ট্রাকে তোলা যাবে?

সবাই গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেল। কাকাবাবু একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, সার্কাস বন্ধ হয়ে গেল?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এর পর বজবজে হবে।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কাল আমরা দেখে গেলাম, তখন তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিছু শুনিনি। আজ আবার দেখব বলে বন্ধুদের নিয়ে এসেছি।"

লোকটি বলল, "কাল আদ্ধেকও টিকিট বিক্রি হয়নি। এরকম

লোকসান দিয়ে চালানো যায় না।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ম্যানেজার?"

লোকটি আঙুল দিয়ে একদিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ম্যানেজারবাবু ওইখানে বসে আছেন।"

সেখানে একটা একতলা বাড়ি। তার বারান্দায় টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছে একজন, আর কয়েকজন ভিড় করে আছে তার সামনে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, কালকের সেই সোনালি কোট পরা লোকটিই ম্যানেজার। কিন্তু এখন তাকে চেনা খুব শক্ত। কাল তার মাথায় ছিল কুচকুচে কালো বাবরি চুল, গায়ে সোনালি কোট, আর সাদা প্যান্ট পরা। আজ তার মাথায় আধখানা টাক, বাকি চুল কাঁচা-পাকা, অর্থাৎ কাল পরচুলা পরে ছিল। পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি, বেশ ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। ম্যানেজার কিছু লোককে হিসেব করে টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে।

কাকাবাবু সামনে এসে বললেন, "নমস্কার ম্যানেজারবাবু। সার্কাস বন্ধ করে দিলেন?"

ম্যানেজার বলল, "হ্যাঁ! এবার বজবজ যাব।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কালই যে শেষ খেলা, তা তো একবারও ঘোষণা করলেন না? আমরা ভেবেছিলাম, আজকে আর একবার দেখব। বিশেষ করে ওই মানুষ অদৃশ্য করার খেলাটা..."

ম্যানেজার বলল, "আহা, ওইজন্যই তো বন্ধ করে দিতে হল এখানে। ও খেলাটা আর দেখানো যাবে না। ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স কাল রাত্তিরেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কত করে বোঝালাম, একশো টাকা বেশি দেব বললাম, তাও থাকতে চাইল না।"

এবার কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি ম্যানেজারের চোখে

চোখ রেখে বললেন, "মিস্টার এক্স কাজ ছেড়ে দিয়েছেন? কেন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

ম্যানেজার বলল, "না, না, ঝগড়া হবে কেন? হঠাৎ বলল, আর খেলা দেখাবে না।"

"উনি আপনার সার্কাসে কতদিন আছেন?"

"ও তো আমার স্টাফ নয়। এখানে তাঁবু ফেলার পর নিজে থেকেই এসে বলেছিল, ওই খেলাটা দেখাবে। আমার মনে হল, ওটা একটা অ্যাট্রাকশান হবে। তা ও খেলাটা লোকে নিচ্ছিল খুব। এরকম তো হয়, যত লোক খেলা দেখায়, সবাই সার্কাসের স্টাফ নয়। কিছু-কিছু লোকাল আর্টিস্টও নিতে হয়। যে লোকটা দু' হাতে দুটো লাঠি নিয়ে খেলা দেখাল, সেও তো লোকাল।"

"মিস্টার এক্স-এর আসল নাম কী?"

"তাও তো আমি জানি না। সে একটা ন্যাড়া-মাথা অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে এসেছিল, তাকেও আমরা ন্যাড়া-ন্যাড়া বলেই ডেকেছি।"

"মিস্টার এক্স কতদিন ওই খেলা দেখিয়েছেন?"

"দশদিন।"

"এই দশদিনে যত লোককে অদৃশ্য করা হয়েছিল, তাদের ফেরত পাওয়া গেছে?"

ম্যানেজার এবার কাকাবাবুর বগলের ক্রাচদুটোর দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল। দু' হাত ছড়িয়ে বলল, "আপনি কাল একটা ছেলের খোঁজ নিতে এসেছিলেন না? আপনি তো বড় তাজ্জব কথা বললেন মশাই। মানুষ কি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হতে পারে নাকি? ও তো ভেলকিবাজি। আলোর কারসাজি। অডিয়েন্সের ভেতর থেকে যদি কেউ আসে, সে খেলা শেষ হওয়ার একটু বাদে নিজের সিটে ফিরে যায়।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল, সে ফিরে আসেনি।"

অসীম দত্ত তাঁর বডিগার্ডকে বললেন, "সুলেমান, এখানকার থানায় চলে যাও। বড়বাবুকে আমার নাম করে ডেকে আনো। এক্ষুনি আসতে বলবে।"

তারপর তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এই সার্কাসের মালিক? আপনার নাম কী?"

ম্যানেজার বলল, "না, সার, আমি ম্যানেজার। তবে মালিকের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার আছে। মালিক থাকেন কানপুরে। আমার নাম জহুরুল আলম। সার্কাসের লাইনের লোকেরা আমাকে জহরভাই বলে চেনে।"

অসীম দত্ত বললেন, "আপনার আজ বজবজ যাওয়া হবে না। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিন, আপনাকে এখানে থাকতে হবে।"

জহুরুল আলম একগাল হেসে বলল, "তাই নাকি? আমি

বজবজ যেতে পারব না ? কে আমায় আটকাবে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "থানা থেকে বড়বাবু আসছেন। তিনি আপনাকে থানায় নিয়ে যাবেন।"

জহুরুল আলম এবার হাসি থামিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল, "বললেই হল ? ওরকম পুলিশ আমার ঢের দেখা আছে। কেন আমায় আটকাবে, আমি কী দোষ করেছি ?"

অসীম দত্ত বললেন, "কাল থেকে আপনারা একটা ছেলেকে গাপ করে রেখেছেন। তাকে ফেরত না পেলে আপনাকে ছাড়া হবে না।"

জহুরুল আলম বলল, "গাপ করে রেখেছি ? খামোকা একটা ছেলেকে ধরে রাখতে যাব কেন ? সে ছোঁড়া নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে, তার জন্য আমার দোষ হল ? তা ছাড়া মিস্টার এক্স খেলা দেখিয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।"

অসীম দত্ত বললেন, "আপনিই তো বললেন, মিস্টার এক্স কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা, তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"

এই সময় হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল। যেখানে ট্রাকগুলোতে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছিল, সেখানকার লোকগুলো প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছে। দু-একজন চেঁচিয়ে বলল, "বাঘ! বাঘ!"

জহুরুল আলমের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল, "সর্বনাশ! নিশ্চয়ই একটা বাঘের খাঁচার দরজা খুলে গেছে!"

এই কথা বলেই সে টেবিলটা উলটে দিয়ে দৌড় মারল।

অসীম দত্ত পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন। কাকাবাবু বললেন, "এ কী করছ, তুমি কি রিভলভার দিয়ে বাঘ মারবে নাকি ? সে-চেষ্টাও কোরো না। তুমি গুলি চালালে বাঘ নির্ঘাত তোমার দিকেই তেড়ে আসবে, ওই গুলিতে ওর কিছু ক্ষতি হবে

না।"

লোকেরা দৌড়চ্ছে, বাঘটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একবার ডাক শোনা গেল।

এই ছোট বাড়িটার দুটো ঘরের দরজাই তালাবন্ধ। ভেতরে আশ্রয় নেওয়া যাবে না, খোলা বারান্দা। কাকাবাবু বললেন, "সবাই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো। গাড়ির মধ্যে থাকলে বাঘ কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।"

অন্যরা দৌড়তে পারে। একমাত্র কাকাবাবুরই দৌড়বার ক্ষমতা নেই। সন্তুও অন্যদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গেল, তারপর কাকাবাবুর কথা মনে পড়ায় আবার ফিরে এল।

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুই ফিরে এলি কেন ? শিগগির যা, গাড়িতে ঢুকে পড়। আমার কিছু হবে না।"

অসীম দত্তকে বারণ করলেও কাকাবাবু নিজের রিভলভারটা হাতে নিলেন। তারপর ক্রাচে ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলেন গাড়ির দিকে।

অন্য লোকেরা এর মধ্যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। মাঠে আর কেউ নেই। এবার দেখা গেল বাঘটাকে। বেরিয়ে এল একটা ট্রাকের আড়াল থেকে। কাকাবাবুর দিকেই সে ছুটে আসছে।

কাকাবাবু গাড়ির কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছেন। অলি হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চিৎকার করছে, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, বাঘ! এসে পড়ল, এসে পড়ল।"

কাকাবাবু বাঘটার দিকে চোখ রেখে পেছোতে লাগলেন। গাড়ির দরজা খুলে অসীম দত্ত ঝট করে কাকাবাবুকে টেনে নিলেন ভেতরে। সব কাচ তুলে দেওয়া হল। ড্রাইভারকে বলা হল, "স্টার্ট দাও, স্টার্ট দাও!"

ড্রাইভার পরিতোষ এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, থরথর করে কাঁপছে। গাড়ির চাবিটা খসে পড়ে গেছে নীচে, সে খুঁজেই পাচ্ছে না।

বাঘটা চলে এল গাড়ির একেবারে কাছে। বেশ বড় বাঘ। কাল সার্কাসের খেলার সময় সবক'টা বাঘকেই মনে হচ্ছিল বুড়ো আর ক্লান্ত, এখন তা মনে হচ্ছে না। চোখ দুটো দারুণ হিংস্র, গরগর আওয়াজ করছে।

বাঘটা দুই থাবা তুলে গাড়ির জানলার কাছে মুখটা ঠেকাল।

অলি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কাচ ভেঙে ফেলতে পারে না?"

অসীম দত্ত বললেন, "চুপ, কথা বলিস না।"

সন্তু ভাবছে, কোন খাঁচার দরজাটা খুলে গেছে? যেটাতে দুটো বাঘ ছিল, না একটা?

বাঘটা ওদের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে, কে জানে!

একটা-একটা মুহূর্ত কাটছে, যেন এক-এক ঘণ্টা। বাঘটা কটমট করে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

অসীম দত্ত নিচু হয়ে চাবিটা খুঁজে পেয়ে ড্রাইভারকে বললেন, "শিগগির চালাও!"

এঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হতেই বাঘটা এক লাফে গাড়ির ছাদের ওপর উঠে গেল। ধড়াম করে একটা শব্দ হল!

এবার কী হবে? বাঘটাকে নিয়েই গাড়িটা চলবে? ড্রাইভার হতভম্ব মুখে অসীম দত্তর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে খুব জোরে হর্ন বাজিয়ে দিলেন।

তাতে কাজ হল। হঠাৎ অত জোর শব্দ শুনে বাঘটা গাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে গেল মাঠে।

গাড়িটা চলতে শুরু করতেই বাঘটা তেড়ে এল সেদিকে।

অলি তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে। যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

এরই মধ্যে কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "আহা রে, বাঘটার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে। এত মুখের গেরাস ফসকে গেল!"

অসীম দত্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "জোরে চালাও, খুব জোরে!"

মাঠটা এবড়োখেবড়ো, মাঝে-মাঝে বড়-বড় গর্ত, গাড়ি জোরে চালানো যায় না, সেটা অনবরত লাফাচ্ছে।

বাঘটা কিন্তু বেশিদূর এল না। কোথা থেকে একটা বন্দুকের গুলির শব্দ হল!

গাড়িটা পাকা রাস্তায় উঠে আসতেই অসীম দত্ত অস্থিরভাবে বললেন, "ডান দিকে যাও, ডান দিকে, থানায়, থানায়!"

এর মধ্যেই বাঘ বেরোবার খবর রটে গেছে। সব দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ, রাস্তায় একটাও লোক নেই। কিছু বাড়ির ছাদে লোকেরা ভিড় করে আছে। সেইরকমই একটা বাড়ির ছাদ থেকে বন্দুক চালাচ্ছে একজন। কিন্তু সেখান থেকে অতদূরে বাঘটার গায়ে গুলি লাগানো অসম্ভব।

থানার সামনেও অন্য কোনও লোক নেই, শুধু তিনজন কনস্টেবল রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের চোখ-মুখে ভয়ের ছাপ। অসীম দত্তর বডিগার্ডও দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের পেছনে। থানার ওসি একটা জিপগাড়িতে বসে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেটা কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না।

এই গাড়িটা পৌঁছতেই ও সি নেমে এসে অসীম দত্তকে স্যালুট দিয়ে বললেন, "স্যার, আমি এক্ষুনি যাচ্ছিলাম, জিপটা গোলমাল করছে। আপনাদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

অসীম দত্ত গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, "বাঘ বেরিয়েছে, এখন কী করবেন? পুলিশ কি বাঘ ধরতে পারে? বাঘ মারাও তো

নিষেধ !"

ও সি বললেন, "এমন আইন হয়েছে, বাঘ ইচ্ছে করলেই মানুষ মারতে পারবে। কিন্তু আমরা বাঘ মারতে পারব না।"

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, "বাঘটা যদি নিজেই এই থানায় উপস্থিত হয়, তখন আপনারা কী করবেন ? আপনাদের কী বাঘ বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা আছে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি এখন রসিকতা করছ, রাজা ? উফ, যা গেল না ! বাঘটা যখন গাড়ির জানলার কাছে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, এই শীতকালেও আমার গা থেকে ঘাম বেরিয়ে গেছে ! সবাই নেমে এসো, থানার ভেতরে গিয়ে বসা যাক !"

ওসি বললেন, "বাঘ ধরার দায়িত্ব টাইগার প্রজেক্ট আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের।"

অসীম দত্ত বললেন, "ডায়মন্ড হারবারে ওদের অফিসে ফোন করুন !"

ওসি বললেন, "খবর পাওয়ামাত্র আমি ফোন করেছিলাম। লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের টেলিফোন খারাপ !"

অসীম দত্ত বিরক্তির ভঙ্গি করে বললেন, "ঠিক দরকারের সময় ফোন খারাপ হয় ! সব সার্কাসের দলের সঙ্গেই বাঘের একজন ট্রেনার থাকে। সে চাবুক নিয়ে শপাং-শপাং করে, বাঘেরা তাকে ভয় পায়। সে-লোকটা গেল কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন কে তাকে খুঁজতে যাবে ?"

সবাই মিলে থানার ভেতরে এসে বসা হল। তারপর মাঝে মাঝেই খবর আসতে লাগল নানা রকম। কেউ বলল, বাঘটা নদীর ধারে গেছে, কেউ বলল, বাঘটা একটা বাড়ির গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়েছে, কেউ বলল, এর মধ্যেই তিনটে মানুষ মেরেছে, কেউ বলল, একই সময় দু'জায়গায় দুটো বাঘ দেখা গেছে, কেউ বলল,

হাতিটাও ছাড়া পেয়ে গিয়ে বাড়িঘর ভাঙছে।

কোনটা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, তা বোঝার উপায় নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। দুপুরে সেরকম কিছু খাওয়া জোটেনি, সব হোটেল বন্ধ। থানার কাছে একটা ছোট চায়ের দোকান, সেটা খোলানো হল প্রায় জোর করে। বন্দুক নিয়ে পাহারায় রইল তিনজন সেপাই। সে দোকানে কয়েকটা ডিম আর বিস্কুট ছাড়া কিছুই নেই। সেই ডিমসিদ্ধ আর বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে খিদে মেটানো হল কিছুটা।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা অসীম, আজ তোমার বিরিয়ানি খাওয়ার কথা ছিল, তার বদলে এ তো কিছুই না !"

অসীম দত্ত বললেন, "বাঘের পেটে গিয়ে যে কিমা হইনি, এই যথেষ্ট !"

এর পর সন্ধে হয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়বে। অন্ধকারে অতর্কিতে বাঘ যে কখন কোথায় হানা দেবে, তা টেরও পাওয়া যাবে না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লঞ্চ এসে পৌঁছল বিকেল সাড়ে চারটের সময়। তাদের সঙ্গে ঘুমপাড়ানি গুলি আছে। ওই গুলি খেয়ে বাঘ ঘুমিয়ে পড়লে তারপর তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন বাঘটা কোথায় আছে, তা খুঁজে বার করা দরকার।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা লঞ্চ থেকে নেমে প্রথমে থানায় এল। তারপর তারা অসীম দত্তর গাড়িটা ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এরা এসে পড়ায় সাধারণ মানুষের সাহস হঠাৎ বেড়ে গেছে। সেই গাড়ির পেছনে শত-শত লোক শাবল, লাঠি নিয়ে ছুটছে। এত লোকের চ্যাঁচামেচিতে ভয় পেয়ে বাঘটা কোথাও ঘাপটি মেরে

লুকিয়ে থাকলে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে।

কাকাবাবু একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আছেন। বাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত বেরোনোই যাবে না। এখন কিছুই করার নেই।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু নিজের পিঠের এক জায়গায় হাত দিয়ে বললেন, "ঘুমপাড়ানো গুলি! একবার একজন আমার ওপর ওই গুলি চালিয়ে ছিল। এখনও দাগ আছে। তোর মনে আছে সন্তু?"

সন্তু বলল, "বাঃ, মনে থাকবে না! তারপর আমরা ত্রিপুরায় গেলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "কী ঘুম ঘুমিয়েছি সেবার! বেঁচে গেছি খুব জোর! আচ্ছা সন্তু, বল তো, এই বাঘের খাঁচার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেছে, না কেউ ইচ্ছে করে খুলে দিয়েছে?"

ঘরের অন্য কোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন অসীম দত্ত। তিনি বললেন, "সে কী! কেউ ইচ্ছে করে খুলে দেবে কেন? এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ করে তার কী লাভ?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা লাভ তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। আমরা জোজোর খোঁজখবর নিতে এসেছিলাম, সেটা বন্ধ করে দিল। যদি সত্যি-সত্যি কেউ জোর করে জোজোকে ধরে রেখে থাকে, সেও এই তালে সরে পড়ার সুযোগ পেল! এখন সবাই বাঘ নিয়ে ব্যস্ত। জোজোর কথা কেউ ভাবছে না।"

সারারাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেও সেই বাঘকে গুলি খাওয়ানো গেল না। বন্দুকধারী পুলিশদের পাহারায় কাকাবাবুদের পৌঁছে দেওয়া হল কাকদ্বীপ ডাকবাংলোতে। সেখানে সুন্দর ব্যবস্থা। মুর্গির মাংসের ঝোল আর ভাতও পাওয়া গেল। শুধু বারান্দায় বসার উপায় নেই, দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকতে হল ঘরের মধ্যে।

শুতে যাওয়ার আগে কাকাবাবু অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে একটা অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জোজোকে দেখেছিলে, তারপর আর কিছু দেখেছ?"

অলি জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল করে ঘুমোও। বাঘের কথা আর ভেবো না। বাঘ এখানে আসবে না। হয়তো স্বপ্নের মধ্যে জোজোকে আবার দেখতে পাবে।"

অন্য ঘরে পাশাপাশি দুটো খাট, সন্তু আর কাকাবাবুর। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল দু'জনে। সন্তুর ঘুম আসছে না। খালি মনে হচ্ছে, বাংলোর পাশ দিয়ে একটা বড় জন্তু দৌড়ে যাচ্ছে। দূরে অনেক কুকুর ডাকছে একসঙ্গে, এখানে কি বাঘটা আছে?

তারপর সে বাঘের চিন্তা জোর করে মন থেকে মুছে ফেলে বলল, "কাকাবাবু, তুমি ঘুমিয়েছ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, কিছু বলবি?"

সন্তু বলল, "আজ সকাল পর্যন্ত আমার অনেকটাই মনে হচ্ছিল, জোজো ইচ্ছে করেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, জোজো এতটা করবে না। এতক্ষণ থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর যা স্বভাব, যদি নিজে লুকোতে চাইত, তা হলে বড়জোর দু'-তিন ঘণ্টা আমাদের ধোঁকায় ফেলে রাখত, তারপরই বেরিয়ে আসত হাসতে হাসতে।"

সন্তু বলল, "বাড়িতে খবর না দিয়ে ও অন্য জায়গায় রাত্তিরে থাকে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু কথা হচ্ছে, কে বা কারা জোজোকে ধরে রাখবে? সেইটাই আমি বুঝতে পারছি না। সার্কাসের লোকেরা কেন একটা ছেলেকে ধরে রাখবে? মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখিয়ে যদি কোনও ছেলেকে ধরে রাখে, তা হলে তো প্রথমেই ওদের ওপর সন্দেহ পড়বে।"

সন্তু বলল, "জাদুকর মিস্টার এক্স কাল রাত্তিরেই সার্কাস ছেড়ে চলে গেছে। এটা সন্দেহজনক নয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ, ম্যানেজার বলল, মিস্টার এক্স নাকি স্থানীয় লোক। আমি থানার ওসি কৃষ্ণরূপবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জাপানি জাদুকর মিস্টার এক্স কোথায় থাকেন, বলতে পারেন! উনি বললেন, ওই নামে কোনও জাদুকরের কথা উনি শোনেননি। তবে রায় রায়হান নামে এখানে একজন ছোটখাটো ম্যাজিশিয়ান আছে, তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। বাঘের ঝামেলা আগে চুকে যাক!"

সন্তু বলল, "বাঘটা যতক্ষণ ধরা না পড়ে, ততক্ষণ আমরা বাইরেই বেরোতে পারব না!"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিন হলে শিকারিরা এসে বাঘটাকে গুলি করে মেরে ফেলত। এখন পৃথিবীতে বাঘের

সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে, বাঘ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বাঘেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প। তাতে অনেক টাকা খরচ হয়। মানুষ যে বাঘদের বাঁচাবার জন্য এত কিছু করছে, বাঘেরা কিন্তু তা জানে না। তারা সুযোগ পেলেই মানুষ মারে। সুন্দরবনে প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষ বাঘের পেটে যায়।"

সন্তু বলল, "সন্ধেবেলা থানা থেকে কলকাতায় ফোন করা হল, জোজো তখনও ফেরেনি। রাত্তিরে আর একবার ফোন করলে হত!"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম একটা ব্যবস্থা করেছে। জোজোদের বাড়ির কাছে যে থানা, সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে, জোজোদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে। জোজো ফিরে আসার খবর পেলেই আমাদের জানিয়ে দেবে! শুধু চিন্তা করে কী হবে, এখন ঘুমো!"

বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল পরদিন সকাল নটায়। এর মধ্যে সে একজন চাষিকে আক্রমণ করেছিল, মারতে পারেনি, শুধু কাঁধে একটা থাবা দিয়েছে। তারপর সে একটা গোরুকে মেরে একটা ঝোপের মধ্যে বসে খাচ্ছিল। কয়েকজন লোক দেখতে পেয়ে ফরেস্ট অফিসারদের খবর দিয়েছে। তাঁরা যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখনও সে কড়মড় করে হাড় চিবিয়ে খাচ্ছিল। সার্কাসে ভাল করে খেতে দেয় না, আফিম-গোলা জল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তাই অনেকদিন পর বাঘটা মনের সুখে খাচ্ছিল সেই মাংস। বন্দুকধারীদের দেখেও সে পালায়নি, গরগর আওয়াজ করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তারপর দুটো গুলি বেঁধার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে তাকে তোলা হয়েছে লঞ্চে।

হাজার-হাজার লোক দেখতে গেছে সেই ঘুমন্ত বাঘকে।

কলকাতা থেকে জোজোর কোনও খবর আসেনি, কিন্তু অসীম

দত্তর জরুরি ফোন এসেছে। আজ দুপুরেই তাঁকে পুলিশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সার্কাসের জিনিসপত্র নিয়ে ট্রাকগুলো সরে পড়েছে এর মধ্যে। ম্যানেজার জহুরুল আলমের কোনও পাত্তা নেই।

অসীম দত্ত বললেন, "পালাবে কোথায়? বজবজে ওকে ধরা হবে। ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম তুমি তা হলে কলকাতায় ফিরে যাও। আমি এখানেই থেকে দেখি জাদুকর মিস্টার এক্স-এর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না। তুমি এই সার্কাসের ম্যানেজার আর যে-লোকটি বাঘের খেলা দেখায়, এই দু'জনকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করো। আমি এখানে যদি কিছু না পাই, ফিরে গিয়ে ওদের জেরা করব।"

অসীম দত্ত মেয়েকে বললেন, "অলি, তা হলে জুতো পরে নে। আমরা এক্ষুনি বেরোব!"

অলি মুখ গোঁজ করে বলল, "আমি যাব না। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে থাকব।"

অসীম দত্ত বললেন, "আর থেকে কী করবি? তোর গানের পরীক্ষা আছে।"

অলি বলল, "এবারে পরীক্ষা দেব না। আবার তিন মাস পরে হবে!"

এর পর অসীম দত্ত মেয়েকে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, অলি কিছুতেই ফিরতে রাজি নয়। তার দু' চোখে টলটল করছে জল।

কাকাবাবু বললেন, "অসীম, মেয়েটার যখন এতই ইচ্ছে, তখন থাক না আমার কাছে। তোমার কোনও ভয় নেই, আমি বেঁচে থাকতে অলির কোনও ক্ষতি হবে না।"

হাল ছেড়ে দিয়ে অসীম দত্ত বললেন, "তোমার কাছে থাকবে, তাতে আবার ভয় কী! ওর মা চিন্তা করবে! ঠিক আছে, তাকে বুঝিয়ে বলব!"

অসীম দত্ত চলে যেতেই কাকাবাবু থানার ওসি কৃষ্ণরূপ রায়কে বললেন, "আপনি এখানকার একজন ম্যাজিশিয়ানের কথা বলেছিলেন না, রায় রায়হান না কী নাম, চলুন, তার সঙ্গে দেখা করব।"

থানার জিপটা এখন ঠিক হয়ে গেছে। সেই জিপে উঠে পড়ল সবাই। যেতে-যেতে কাকাবাবু ওসি-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই সার্কাসে দশদিন ধরে মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখানো হয়েছে। সবাই নিশ্চয়ই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়নি। আপনার কাছে এখানকার লোক হারিয়ে যাওয়ার কোনও রিপোর্ট এসেছে?"

ওসি বললেন, " না সার। ওই ম্যাজিকের খেলা আমিও দেখেছি। ও তো ম্যাজিকই। মানুষ তো সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয় না। আমি যেদিন সার্কাসে যাই, সেদিন সতীশ নামে একজন লোককে অদৃশ্য করা হয়েছিল। সেই সতীশ তো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে! পরশুও দেখেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই সতীশকেও আমার দরকার। জাদুকর তাকে অদৃশ্য করার পর তার কী হয়েছিল, নিশ্চয়ই বলতে পারবে।"

ওসি বললেন, "আমি সতীশকে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার কৌতূহল হয়েছিল, সতীশ ঠিক বলতে পারে না। সে শুধু বলল, তার মাথা ঝিমঝিম করেছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখেছিল, তারপর কী হল তার মনে নেই। খানিক বাদে সে দেখল যে পরদার পেছনে বসে আছে। তাকে শিঙাড়া আর রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এখানে মানুষজন হারিয়ে যাওয়ার কোনও রিপোর্ট নেই ?"

ওসি বললেন, "উঁহুঃ ! তবে দিন দশেক আগে একটা ষোলো সতেরো বছরের ছেলে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার ডেডবডিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ-কেউ বলছে, ছেলেটা ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ছেলেটা এখানকার স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিল, এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।"

জিপটা থামল একটা দর্জির দোকানের সামনে। কিছু লোক এখনও সেখানে জটলা করে বাঘের গল্প বলছে। অনেকের ধারণা আর একটা বাঘ এখনও রয়ে গেছে এখানে। পুলিশের জিপ দেখে সবাই চুপ করে গেল।

দর্জির দোকানের মালিকের নাম পরেশ জানা। সে বই পড়ে নিজে-নিজেই কিছু ম্যাজিক শিখেছে। রথের মেলায়, দুর্গাপুজোর সময় ম্যাজিক দেখায়।

দোকানের পেছনদিকের একটা ঘর আছে। সেই ঘরে বসে কাকাবাবু পরেশ জানাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স-কে চেনেন ?"

পরেশ দু'দিকে জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বলল, "নাঃ ! কক্ষনও নামও শুনিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু সে এখানকারই লোক শুনলাম যে !"

পরেশ বলল, "এখানকার কেউ ম্যাজিক শিখলে আমি জানতাম না ? এ কোনও বাইরের উটকো লোক ! মুখে সবসময় মুখোশ পরে থাকে, ওর আসল মুখও তো কেউ দেখেনি !"

কাকাবাবু বললেন, "সবসময় মুখোশ পরে থাকে ?"

পরেশ বলল, "তাই তো শুনেছি। সার্কাসের বাইরে রাস্তাঘাটে তাকে দেখা যায়নি। তবে, কিছুদিন আগে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়ে গেল, সেখানেও নাকি ওই মিস্টার এক্স জাদুর খেলা দেখিয়েছে। দুটি ছেলেকে অদৃশ্য করে দিয়েছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

কাকাবাবু ও সি-র দিকে ফিরে বললেন, "গঙ্গাসাগর মেলায় দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, সে-রিপোর্ট আপনারা পাননি ?"

ওসি বললেন, "দেখুন, গঙ্গাসাগর মেলায় দূর-দূর থেকে কত মানুষ আসে, প্রতি বছরই কয়েকজন হারিয়ে যায়, আবার বোধ হয় তাদের পাওয়াও যায়। মোট কথা, আমাদের থানায় ডায়েরি করেনি কেউ !"

পরেশ বলল, "সার, আমাদের দেশে কত মানুষ, চতুর্দিকে মানুষ গিসগিস করছে, তার মধ্যে দু-চারটে কখন কোথায় হারিয়ে গেল, তা নিয়ে কি পুলিশের মাথা ঘামাবার সময় আছে ?"

ওসি পরেশকে জিজ্ঞেস করলেন, "গঙ্গাসাগর মেলায় ম্যাজিক দেখাবার সময়ই যে দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, তা তুমি জানলে কী করে ?"

পরেশ বলল, "আমার ভাইপো ওই মেলায় গিয়েছিল। তার কাছে শুনেছি। সে ওই ম্যাজিক দেখেছে। তারপর বিহারের এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খুব চ্যাঁচামেচি করেছিল। আর একটা ছেলের সঙ্গে ছিল তার মা আর মাসি। সেই মহিলা দু'জন খুব কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু ছেলেটাকে পাওয়া যায়নি !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ম্যাজিশিয়ানের কাছে লোকে জবাবদিহি চায়নি কেন ?"

পরেশ বলল, "মুখোশ-পরা ম্যাজিশিয়ান। মুখোশটা খুলে সে

যদি ভিড়ে মিশে যায়, তা হলে তাকে কে চিনবে ? আমি সার অনেক ম্যাজিক দেখেছি, কলকাতাতেও দেখেছি, কিন্তু কোনও মুখোশপরা ম্যাজিশিয়ানের কথা বাপের জন্মে শুনিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা পরেশবাবু, আপনি তো অনেক ম্যাজিক জানেন। বেশ ভাল ম্যাজিক দেখান শুনেছি। আপনি মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাতে পারেন ?"

পরেশ অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "আমি ওসব আজেবাজে খেলা দেখাই না। ও তো ভেলকিবাজি। যন্ত্রপাতি আর আলোর খেলা। আমি দেখাই শুধু হাতের খেলা। দেখবেন, দেখুন !"

পরেশ পকেট থেকে একটা এক টাকার মুদ্রা দেখাল। সেটা ডান হাতে নিয়ে বলল, "দেখতে পাচ্ছেন তো, ভাল করে দেখুন, এটা একটা টাকা। এই যে ওপরে ছুড়ে দিচ্ছি। এই যে লুফে নিলুম। দেখলেন তো ? আবার ছুড়ে দিচ্ছি ! কই গেল ?"

টাকাটা নেই। পরেশ দুটো হাত উলটেপালটে দেখাল। কোনও হাতেই টাকাটা নেই।

পরেশ হাসতে-হাসতে বলল, "দেখতে পেলেন না ? ভাল করে দেখেননি। এই তো !"

পরেশ আবার ডান হাতটা ওলটাতেই দেখা গেল সেখানে রয়েছে টাকাটা।

পরেশ বলল, "এই হচ্ছে হাতের খেলা। এ শিখতে এলেম লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, চমৎকার !"

সন্তু আর অলি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার অলি বলল, "আর-একটা, আর-একটা দেখান !"

পরেশ অলির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখবে ? তোমার হাত

দুটো বাড়িয়ে দাও !"

পরেশ অলির হাত দুটো ধরে একটুক্ষণ মুঠো করে রাখল। তারপর আবার খুলে আবার মুঠো করে দিল।

অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "এই মেয়েটির একটা হাতে আমি সেই টাকাটা রেখে দিয়েছি। বলুন তো, কোন হাতে সেই টাকাটা আছে ?"

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "তুমিই বলো, কোন হাতে ?"

সন্তু অলির ডান হাতটা ছুঁয়ে দিল।

মুঠো খুলতে দেখা গেল, টাকাটা রয়েছে সেই হাতে।

পরেশ বলল, "বাঃ, তুমি ঠিক ধরেছ তো। এক চান্সেই বলে দিলে ? আচ্ছা, এবার বাঁ হাতটা খুলে দেখাও তো খুকুমণি !"

বাঁ হাতের মুঠো খুলতে দেখা গেল, সে-হাতেও রয়েছে এক টাকা। একটা মুদ্রা দুটো হয়ে গেছে !

কাকাবাবু বললেন, "দারুণ তো !"

পরেশ সগর্বে বলল, "আমার যন্ত্রপাতি লাগে না। শুধু হাতে খেলা দেখাই !"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের উঠতে হয়। তা হলে, মিস্টার এক্স এই অঞ্চলে কোথায় থাকে, আপনি বলতে পারবেন না ?"

পরেশ বলল, "আমার ধারণা, সে এখানকার লোক নয়। বিদেশি। গঙ্গাসাগর মেলার সময় সে একটা লঞ্চে করে এসেছিল। আমার ভাইপো তাকে একবার একটা লঞ্চ থেকে নেমে আসতে দেখেছে। আপনারা তাকে খুঁজছেন তো। একবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে দেখুন, সেখানে পাওয়া যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "মেলা শেষ হয়ে গেলে তো সেখানে আর কেউ থাকে না।"

ওসি বললেন, "এখন সারা বছরই কিছু লোক যায়। কয়েকটা হোটেল আর গেস্ট হাউস হয়েছে। কপিল মুনির আশ্রমের কাছে কয়েকজন সাধুও থাকে।"

পরেশ বলল, "কেউ লুকিয়ে থাকতে চাইলে ওটা খুব ভাল জায়গা। মেলার সময় ছাড়া সারা বছর ওখানে পুলিশ যায় না।"

কাকাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল একজন বেশ সুদর্শন যুবক। সাদা প্যান্ট ও নীল হাওয়াই শার্ট পরা। সে হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার। আপনি রাজা রায়চৌধুরী, দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে আমি মিস্টার রায়চৌধুরী বলতে পারব না, আপনাকে আমি কাকাবাবু বলে ডাকব, আমি আপনার ভক্ত। আমি এই মহকুমার পুলিশ অফিসার। আমার নাম অর্ক মজুমদার।"

কাকাবাবু বললেন, "অসীমের কাছে আপনার কথা শুনেছি।"

অর্ক বলল, "আপনি নয়, আপনি নয়, আমাকে তুমি বলবেন। আমি একটা খবর দিতে এসেছি। জুয়েল সার্কাস পার্টির নামে অনেক অভিযোগ এসেছে। বাঘের খাঁচার দরজা খুলে যাওয়ায় চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই আমি চতুর্দিকে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে ওই সার্কাসের যে-কোনও লোককে দেখলেই অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিয়েছি। ওরা বলেছে, বজবজের দিকে যাবে, এই ঘটনার পর অন্যদিকে পালাবার চেষ্টা করাই তো ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের সঙ্গে বাঘ আছে, হাতি আছে, আরও কত জিনিসপত্র, এতসব নিয়ে ওরা পালাবে কী করে?"

অর্ক বলল, "বনে-জঙ্গলে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। ধরা পড়বে ঠিকই, কিন্তু দেরি হতে পারে। এর মধ্যেই একজন ধরা পড়েছে। আমি তাকে জেরা করার জন্য নিয়ে

আসতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই যাব! যে ধরা পড়েছে, সে সার্কাসে কী করত?"

অর্ক বলল, "তা বলতে পারছি না। একজন কনস্টেবল তাকে এই সার্কাসে দেখেছে। সে লোকটি হারউড পয়েন্ট থেকে লঞ্চে উঠতে যাচ্ছিল।"

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "হারউড পয়েন্ট? সেখানে কি সারা বছর লঞ্চ চলে?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, এখন চলে। দেখলেন, এটা বজবজের একেবারে উলটো দিকে।"

পরেশ দর্জি বলল, "ওখান দিয়েই তো গঙ্গাসাগর যায়। দেখলেন, আমি ঠিক বলেছিলাম কি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো দেখছি।"

অর্ক এনেছে একটা স্টেশন ওয়াগন। কাকদ্বীপ থানার ওসি-কে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু সদলবলে অর্কর গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার পর অর্ক বলল, "কাকাবাবু, কাল রাত্রে ওই ব্যাঘ্রকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর খবর পেয়ে কলকাতা থেকে অনেক সাংবাদিক চলে এসেছে। এমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার তো বিশেষ হয় না। সাংবাদিকরা আপনাকে চিনতে পারলে কিন্তু বিরক্ত করে মারবে। আপনার চোখের সামনেই তো বাঘটা বেরিয়েছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "চোখের সামনে মানে? আমাদের গাড়ির মাথায় বাঘটা চেপে বসে ছিল।"

অর্ক বলল, "এই গল্প শুনলে কি আর সাংবাদিকরা আপনাকে ছাড়বে? আপনি মাথাটা নিচু করে থাকুন, যাতে কেউ দেখতে না পায়। কলকাতাতেও খবর নিয়েছি, আপনাদের সেই জোজো

এখনও ফেরেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তুমি তো বেশ কাজের ছেলে! তোমাকে দেখলে পুলিশ অফিসার মনে হয় না। মনে হয় যেন কলেজের ছাত্র!"

অর্ক বলল, "পরীক্ষা দিয়ে দু'বছর আগে চাকরি পেয়েছি। তার আগে তো ছাত্রই ছিলাম। কী হে সন্তু, তুমি কিছু কথা বলছ না যে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "যে-লোকটা ধরা পড়েছে, তাকে কেন কাকদ্বীপে নিয়ে আসা হল না? আপনাকে যেতে হচ্ছে কেন!"

অর্ক বলল, "ওখানে কোনও গাড়ি নেই। ধরা পড়ার পরেও লোকটা পালাবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের কনস্টেবল, আরও দু-তিনজন মিলে তাকে জাপটে ধরে বেঁধে রেখেছে। ওর কাছে কয়েকটা বড়-বড় আলোর বাল্ব পাওয়া গেছে। চুরি করেছে কি না কে জানে, নইলে পালাবার চেষ্টা করবে কেন?"

কাকদ্বীপ থেকে হারউড পয়েন্ট বেশি দূর নয়। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, ফেরিঘাটের পাশে এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষ। কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। সন্তু আগে-আগে দৌড়ে গেল।

সেই ভিড় ঠেলে মাঝখানের হাত-পা-বাঁধা মানুষটাকে দেখে সন্তু খুশিতে শিস দিয়ে উঠল।

মাথায় একটাও চুল নেই, চকচকে টাক, ভুরুও দেখা যায় না, এ তো সেই ম্যাজিশিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সন্তুর গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

কাকাবাবু আসতেই সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই ম্যাজিশিয়ান এক্স-ও ছিল। মুখোশ খোলা থাকলে তো তাকে কেউ চিনতে পারবে না। এ ধরা পড়ার পর

ম্যাজিশিয়ান পালিয়েছে।"

কাকাবাবু চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "এই ভিড়ের মধ্যে মিশে সে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে!"

লোকটি শুয়ে ছিল মাটিতে। তার জামা-প্যান্ট ভেজা। পালাবার জন্য সে ঝাঁপ দিয়েছিল নদীতে। সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা হয়েছে।

অর্ক কাছে গিয়ে লোকটিকে দাঁড় করাল। তারপর তার জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী রে, পালাতে চাইছিলি কেন? কী দোষ করেছিস?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না।

অর্ক আবার জিজ্ঞেস করল, "তোর নাম কী? সার্কাসে তুই কী কাজ করিস?"

লোকটি এবারেও চুপ।

অর্ক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "কথা বলছিস না কেন? যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দে!"

লোকটি মুখ না খুলে সোজা চেয়ে রইল অর্কর দিকে।

কনস্টেবলটি এবার লাঠি তুলে মারার ভঙ্গি করে বলল, "এই, সাহেব যা জানতে চাইছেন, জবাব দে, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব!"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও, মারবার দরকার নেই। একে আমরা চিনি। ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স-এর সহকারী। সেই ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলা আমার খুব দরকার। ম্যাজিশিয়ান কোথায় গেছে, এ নিশ্চয়ই বলতে পারবে। কিন্তু এখানে এত লোকের মধ্যে জেরা করে লাভ নেই। কোথাও গিয়ে বসতে হবে।"

অর্ক বলল, "তা হলে কাকদ্বীপের থানায় যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "কাকদ্বীপে না। এই লোকটা এখান থেকে লঞ্চ ধরে গঙ্গাসাগরের দিকে যেতে চাইছিল, কেন ? চলো, আমরাও সেখানেই যাই। গাড়িটা এখানে থাকবে ?"

অর্ক বলল, "গাড়িসুদ্ধই যাওয়া যেতে পারে। সে-ব্যবস্থা আছে। শুধু এখন জোয়ার না ভাটা তা দেখতে হবে।"

ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন চেঁচিয়ে বলল, "জোয়ার, জোয়ার। ওই তো ফেরির লঞ্চ আসছে।"

এখানে দু'রকম লঞ্চ চলে। একরকম লঞ্চে শুধু যাত্রী পারাপার করে। আর-একরকম লঞ্চে গাড়ি, বাস, ট্রাক সব উঠে যায়। তাতেও যাত্রীরা যায় কিছু-কিছু।

গাড়ির সামনের সিটে কনস্টেবলটি ন্যাড়ামাথা লোকটিকে ধরে বসে রইল। পেছনের সিটে আর সবাই।

গঙ্গা এখানে বিশাল চওড়া। বড়-বড় ঢেউ। হুহু করছে হাওয়া। অনেক মাছধরার নৌকো ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে।

অলি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি সমুদ্রে যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সমুদ্রের দিকেই যাচ্ছি। তবে এখনই নয়। দেখছ তো, এই লঞ্চটা কোনাকুনি গঙ্গা পার হচ্ছে। ওদিকে একটা দ্বীপ আছে। খুব বড় দ্বীপ, সেখানে মানুষজন থাকে। সেই দ্বীপের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে অনেকটা গেলে, একেবারে শেষে গঙ্গার মোহনা। মোহনা কাকে বলে জানো ?"

অলি বলল, "হ্যাঁ, নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই মোহনার নাম গঙ্গাসাগর। অনেকের ধারণা, সেখানে স্নান করলে খুব পুণ্য হয়, তাই বছরে একবার বহু দূর দূর থেকে মানুষ এসে গঙ্গাসাগরে ডুব দেয়।"

অলি বলল, "আমিও ডুব দেব। কিন্তু আমি সাঁতার জানি

না।"

কাকাবাবু বললেন, "সাঁতার না জানলেও ডুব দিতে পারবে। ভয় নেই। সন্তু তোমার পাশে থাকবে।"

অলি জিজ্ঞেস করল, "সন্তুদা বুঝি ভাল সাঁতার জানে ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সন্তুকে যদি এই গঙ্গায় ঠেলে ফেলে দাও, ও ঠিক সাঁতরে ওপারে চলে যাবে।"

অর্ক বলল, "তাই নাকি ! সন্তু তোমার সঙ্গে একদিন সাঁতারের কম্পিটিশন দিতে হবে। আমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় দু-তিনটে প্রাইজ পেয়েছি।"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে বলল, "আমি তেমন কিছু ভাল পারি না।"

কাকাবাবু অর্ককে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি জুয়েল সার্কাসের শো দেখেছ ?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, দেখে গেছি একবার। বেশির ভাগ খেলাই অতি সাধারণ। গ্রামের মানুষদের ভাল লাগবে, আমরা ধরে ফেলি।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ অদৃশ্য করার খেলাটা ?"

অর্ক বলল, "ওটা তো খুব সোজা ! ওই যে উঁচু করে স্টেজটা বানিয়েছিল, ওর মাঝখানে কিছুটা জায়গা কাটা। তার ওপর একটা আলগা তক্তা পাতা থাকে। একজন লোককে সেখানে দাঁড় করায়, তারপর অনেক আলো জ্বলতে নিভতে থাকে, ম্যাজিশিয়ান লোকটাকে একটা কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়, পা দিয়ে একটা শব্দ করে তক্ষুনি স্টেজের নীচ থেকে ওর সহকারী তক্তাটা সরিয়ে লোকটাকে নীচে টেনে নেয়।"

অর্ক সামনে ঝুঁকে ন্যাড়ামাথা লোকটার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, "কী রে, তাই নয় ?"

সে ফিরে তাকাল না, কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, "তা ছাড়া আর কী হবে! কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় চোখের নিমেষে ঘটে যায়।"

অর্ক বলল, "সেটাই তো প্র্যাকটিস। তা ছাড়া আলোর খেলায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।"

সন্তু বলল, "যাদের অদৃশ্য করা হচ্ছে, তারা তো ফিরে এসে কায়দাটা বলে দিতে পারে।"

অর্ক বলল, "তা তো পারেই। বললেই বা ক্ষতি কী? আগে থেকে কায়দাটা জানলেও যে-সময় ওরা খেলাটা দেখায়, সে-সময় একটুও ধরা যায় না। মনে হয়, সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "অদৃশ্য হওয়ার খেলার পর আমাদের জোজোকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই একই ম্যাজিশিয়ান গঙ্গাসাগর মেলাতেও ওই খেলা দেখিয়েছে। দর্জি ভদ্রলোক বললেন, তখনও নাকি দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে।"

অর্ক বলল, "মেলাতে অত ভিড়ের মধ্যে প্রতি বছরই..."

কাকাবাবু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সেটা জানি। কিন্তু আমি একটা অন্য কথা ভাবছি। আমাদের জোজোর বয়েস সতেরো। মেলায় যে দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, তাদের বয়েসও ষোলো-সতেরো। কাকদ্বীপের ওসি বললেন, কয়েকদিন আগে একটি ছেলে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল, তার বয়েসও সতেরো, তাকে আর কেউ দেখেনি, তার ডেডবডিও পাওয়া যায়নি। হঠাৎ ঠিক ওই এক বয়েসের ছেলেরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এটা খুব পিকিউলিয়ার না?"

অর্ক বলল, "এটা কাকতালীয় হতে পারে। তা ছাড়া এই বয়সের ছেলেরাই বাড়ি থেকে পালায়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের জোজো বাড়ি থেকে পালাবার

ছেলে নয়। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখেছে।"

অর্ক অবাক হয়ে বলল, "সে কী! এর মধ্যেই সেটা ধরে নিচ্ছেন কী করে?"

কাকাবাবু অলির মাথায় হাত রেখে হেসে বললেন, "ধরে নিইনি, সেটা আমাদের এই অলি দিদিমণি জানে।"

অর্ক বলল, "ও কী করে জানবে? ও কি দেখেছে নাকি!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব, এই যে আমরা এসে গেছি!"

ফেরি লঞ্চটা ভ্যাঁ- ভ্যাঁ করে করে ভেঁপু বাজিয়ে জেটিতে এসে ভিড়ল। গাড়িটা উঠে এল উঁচু রাস্তায়।

অর্ক বলল, "আমরা পি ডব্লু ডি'র বাংলোয় থাকব, সেখানে রান্নাবান্না করে দেবে। খুব ভাল ব্যবস্থা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব জায়গায় বেড়াতে এসে ভালই লাগে। কিন্তু মাথার মধ্যে জোজোর চিন্তা ঘুরছে। জোজোকে যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুই ভাল লাগছে না।"

অর্ক বলল, "যারা ছেলেধরা, তারা সাধারণত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চুরি করে। পাঁচ বছর, সাত বছর, বড়জোর আট-ন'বছর। কিন্তু একটা ষোলো-সতেরো বছরের জোয়ান ছেলেকে চুরি করাটা খুবই অস্বাভাবিক। এরকম শোনা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "অস্বাভাবিক তো বটেই? ম্যাজিক দেখাবার ছল করে একটা ছেলেকে সত্যি-সত্যি অদৃশ্য করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়?"

অর্ক বলল, "ওই ম্যাজিশিয়ানই যে জোজোকে চুরি করেছে, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। হয়তো এটা সার্কাসের ম্যানেজারের

কারসাজি।"

কাকাবাবু বললেন, "কে সত্যি দায়ী, তা এই লোকটাকে জেরা করে জানা যেতে পারে।"

দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি, সকলেরই খিদে পেয়ে গেছে বেশ। বাংলোতে পৌঁছতে অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কাকাবাবু অনেক বছর আগে এসেছিলেন গঙ্গাসাগরে, তখন এখানে বাড়িঘর প্রায় কিছুই ছিল না। এখন অনেক বাংলো, গেস্ট হাউস, ইয়ুথ হস্টেল হয়ে গেছে। কয়েকটা ছোটখাটো হোটেল আর চায়ের দোকানও আছে। একটা হোটেল থেকে রুটি আর আলুর দম কিনে আনা হল।

খেতে-খেতে অর্ক বলল, "কাকাবাবু, আপনি প্রথমে এই টাকলু লোকটাকে জেরা করে কিছু কথা বার করতে পারেন কি না দেখুন। মনে হচ্ছে, এ-ব্যাটা গভীর জলের মাছ। সহজে মুখ খুলবে না। যদি আপনি না পারেন তা হলে আমি চেষ্টা করব। থার্ড ডিগ্রি দিলেই ওর পেটের কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাবে।"

অলি জিজ্ঞেস করল, "থার্ড ডিগ্রি কী?"

অর্ক বলল, "সেটা ছোটদের জানতে নেই। যখন আমি থার্ড ডিগ্রি দেব, তখন তুমি আর সন্তু সেখানে থাকতে পারবে না।"

সন্তু বলল, "পা বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া?"

কাকাবাবু বললেন, "অত সব লাগবে না।"

অর্ক বলল, "আমি ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখে আসি। মুখোশ-পরা ম্যাজিশিয়ান সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে কিনা খোঁজ নিই। আপনারা কিন্তু সাবধানে থাকবেন। দেখবেন, ও ব্যাটা না পালায়।"

কাকাবাবু বললেন, "না, পালাবে কী করে? হাত-পা বাঁধা

আছে। ওকে এখন কিছু খেতেও দেওয়া হবে না। খাবার সামনে রেখে লোভ দেখাতে হবে। আপাতত ওকে একটা ঘরে আটকে রাখা হোক। এর মধ্যে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল রাত্তিরে একে তো বাঘের উপদ্রব, তার ওপর জোজোর চিন্তায় আমার ভাল করে ঘুম হয়নি।"

একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে কাকাবাবু ঠিক চল্লিশ মিনিট ঘুমোলেন। তারপর উঠে পড়ে সন্তুকে বললেন, "এবার লোকটিকে এ-ঘরে নিয়ে আয়।"

অলিকে বললেন, "তুমি একটা প্লেটে ওর জন্য রুটি আর আলুর দম এনে টেবিলের ওপর রাখো।"

এখানে শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে অনবরত। বেশ শীত-শীত ভাব। কাকাবাবু কোট পরে আছেন। কিন্তু টাক-মাথা লোকটার গায়ে শুধু পাতলা একটা সুতির জামা। সেটা এখন শুকিয়ে গেছে। তার হাত ও পা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে এল লাফাতে-লাফাতে, সন্তু তাকে পেছন থেকে ঠেলছে।

কাকাবাবু বললেন, "ওহে, তোমার নামটা আগে বলো, না হলে তোমাকে ডাকব কী করে? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া যেমন বলতে নেই, তেমনই ন্যাড়া-মাথা লোককে নেড়ু কিংবা টাক-মাথা লোককে টাকলু বলতে আমার খারাপ লাগে। কী নাম তোমার?"

লোকটি উত্তর তো দিলই না, এমন ভাব দেখাল যেন শুনতেই পায়নি।

কাকাবাবু আবার বললেন, "খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ? আমরা পেটপুরে খেলাম, আর তোমাকে খেতে দিইনি, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। এক্ষুনি খাবার পাবে। তার আগে কয়েকটা কথার উত্তর দাও তো চটপট। সন্তু, ওর পা আর হাতের বাঁধন খুলে দে। দেখতে খারাপ লাগছে। হাত-বাঁধা থাকলে খাবে কী করে ?"

সন্তু ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে লক্ষ্মী ছেলের মতন টেবিলের উলটো দিকের ওই চেয়ারটায় বোসো।"

কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে বললেন, "এটা দেখেছ তো ? পালাবার চেষ্টা করলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। সারাজীবন খোঁড়া থাকার যে কী কষ্ট, তা তো আমি জানি, তুমিও হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। এবারে বলো তো, ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স কোথায় ?"

লোকটি চেয়ারে বসল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

কাকাবাবু বললেন, "কেন সময় নষ্ট করছ ? তোমার কোনও ভয় নেই, কেউ মারধর করবে না। সত্যি কথা বলো, একটু বাদেই ছাড়া পাবে। আমাদের সঙ্গে জোজো বলে যে ছেলেটি ছিল, তার কী হয়েছে ? কে তাকে আটকে রেখেছে ?"

লোকটি মুখ বুজে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর চোখের দিকে।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, লোকটি বোধ হয় বোবা। সেই যে টুল থেকে পড়ে গেল, আঃ উঃ কোনও শব্দ করেনি। ম্যাজিশিয়ানটা ওকে চড় মারল, তাও কিছু বলেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যিকারের বোবা না হয়েও বোবা সেজে থাকতে পারে। বোবারা সাধারণত কানেও শোনে না। এর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছে, বুঝতেও

পারছে। মুখটা ফাঁক করে দ্যাখ তো, জিভটা কাটা কি না।"

সন্তু ওর মুখখানা ধরে ঠোঁট ফাঁক করে দিল, তাতে ও আপত্তি জানাল না। কটমট করে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

জিভ কাটা নয়, ঠিকই আছে।

অলি খাবারের প্লেটটা রাখল টেবিলের ওপর। সে সেদিকে চেয়েও দেখল না।

কাকাবাবু বললেন, "কথা বলতে জানো না ? লেখাপড়া জানো ?"

তিনি কোটের পকেট থেকে নোটবই আর কলম বার করে লিখলেন, "ম্যাজিশিয়ান কোথায় ?"

লেখাটা লোকটিকে দেখিয়ে নোটবই আর কলম এগিয়ে দিলেন। সে ওসব ছুঁল না।

সন্তু বলল, "এমন হতে পারে, বাংলা জানে না। ম্যাজিশিয়ানটা ইংরিজি বলছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যাজিশিয়ানের মুখ আমরা দেখিনি। কিন্তু এর মুখ দেখে বোঝা যায় না যে, পুরো বাঙালি ? এ লোকটি আলবাত বাঙালি। ইচ্ছে করে কথা বলছে না।"

হঠাৎ লোকটি মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। অদ্ভুত শব্দ। ক্রমে শব্দটা জোর হতে লাগল আর সে দোলাতে লাগল মাথাটা।

কাকাবাবু বললেন, "এ আবার কী ব্যাপার ?"

অলি দেওয়ালের এক কোণে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "ভয় করছে, আমার ভয় করছে।"

লোকটি এবার সামনের দিকে ঝুঁকে চট করে একটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিল কাকাবাবুর কপাল।

সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি

চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর মাথাটা ঢলে পড়ল টেবিলের ওপর।

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এক ঝটকায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর দৌড়ে বেড়িয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কিন্তু সে পালাতে পারল না। তার দুর্ভাগ্য, ঠিক তখনই অর্ক ফিরে এল গাড়ি নিয়ে। লোকটিকে পালাতে দেখে অর্ক লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাড়া করল তাকে। ধরেও ফেলল। জড়াজড়ি করে দু'জনে পড়ে গেল মাটিতে। টাক-মাথা লোকটির গায়ের জোর বেশি, তবু নিজেকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না, অর্ক নানারকম কায়দা জানে, সে লোকটির একটা হাত পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে মোচড়াতে লাগল। গাড়ি থেকে কনস্টেবলটিও লাঠি নিয়ে পৌঁছে গেল সেখানে।

এর মধ্যে কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি হাহা করে হেসে উঠলেন। অর্ক যখন পলাতকটিকে ঠেলতে-ঠেলতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল তখনও কাকাবাবু হাসছেন আর আপন মনে বলছেন, ব্যাটা হিপনোটাইজ করল আমাকে! অ্যাঁ? এটা হাসির কথা নয়। রাজা রায়চৌধুরীকেও কেউ হিপনোটাইজ করার সাহস পায়?

অর্ক বলল, "এ কী কাকাবাবু, আপনি ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন? আর একটু হলে পালাচ্ছিল!"

কাকাবাবু সে-কথা গ্রাহ্য না করে হাসিমুখে বললেন, "আমাকে হিপনোটাইজ করল? ঘুমিয়ে ছিলাম তো, ঘুম ভাঙার পরেও কিছুক্ষণ মাথার জড়তা কাটে না, তাই ও পেরেছে! এবার তো ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ওকে আবার চেয়ারে এনে বসাও!"

অর্ক সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "ও কিছু স্বীকার করেছে?"

সন্তু বলল, "একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।"

অর্ক লোকটির গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে বলল, "ফের পালাবার চেষ্টা করবি?"

কাকাবাবু বললেন, "মেরো না, মেরো না। মারধর আমার পছন্দ হয় না। তবে ও যদি খোঁড়া হতে চায়, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আবার পালাবার চেষ্টা করলেই খোঁড়া হবে। আমার সামনে ওকে বসাও।"

অর্ক ওকে বসাল, হাত দুটো পেছনে মুড়ে বেঁধে দিল। কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ওর নামও বলেনি? ব্যাটার মাথায় একটাও চুল নেই, দাড়ি গোঁফ নেই। ওর নাম দেওয়া হোক মাকুন্দ।"

কাকাবাবু বললেন, "মাকুন্দ শব্দটা শুনতে ভাল নয়। বরং বলা যাক তুবরক। ভীমের দাড়ি-গোঁফ ছিল না, তাই তার এক নাম ছিল তুবরক। ওহে তুবরক, তুমি তো আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিলে। আর-একবার করো দেখি! আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে তুমি চেনো না।"

অর্ককে বললেন, "তুমি পেছন থেকে সরে যাও। আমার ধারণা, ও-বিদ্যেটা সারা দেশে আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। শিখেছিলাম লাদাখের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে। ও-বিদ্যে যখন-তখন ব্যবহার করতে গুরুর নিষেধ আছে। কিন্তু কেউ আমার ওপর ওটা চালাতে গেলে তাকে আমি ছাড়ি না।"

লোকটি এখনও কটমট করে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবু তার মুখের সামনে একটা হাত ঘোরাতে লাগলেন, আর আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, "তাকিয়ে থাকো, তাকিয়ে থাকো, আমি যা বলব তা শুনবে, আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার উত্তর দেবে, তাকিয়ে

থাকো, তাকাও আমার দিকে।"

লোকটির চোখ এবার একটু-একটু করে বুজে আসতে লাগল, তারপর পুরোটা বুজে গেল।

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, "চোখ খোলো!"

লোকটি চোখ খুলল, কিন্তু চোখের তারা দুটি একেবারে স্থির। পলক পড়ছে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

লোকটি ধীরে-ধীরে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কেউ না? সে আবার কী? ম্যাজিশিয়ান এখন কোথায়?"

আবার সে মাথা নাড়ল দু'দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। ম্যাজিশিয়ানটি কোথায় লুকিয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি জানো, বলো সে কোথায়?"

লোকটি আবার দু'দিকে মাথা নাড়ল, তার মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণার রেখা।

কাকাবাবু এবার অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, "এ-লোকটা বোবা নয়। কিন্তু কোনও কারণে ওর কথা বলার ক্ষমতাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ওর মনের মধ্যে ঢুকতে পারছি না। খানিক বাদে ঠিক পারব, আচ্ছা দেখা যাক, মুখে বলতে না পারলেও ও লিখতে পারে কি না!"

কাগজ-কলম এগিয়ে দিয়ে কাকাবাবু লোকটিকে বললেন, "ওহে তুবরক, জোজো কোথায় আছে, এখানে লিখে দাও!"

লোকটি কলমটি তুলে নিয়েও থেমে রইল।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "লেখো!"

লোকটি এবার লিখতে শুরু করল। আঁকাবাঁকা অক্ষর। সবাই

ঝুঁকে পড়ল? হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগল সে কী লেখে।

লোকটি একটু লিখেই কলম তুলে নিল। সে লিখেছে, মহিষ কালী।

কাকাবাবু বললেন, "এ আবার কী? এর কী মানে হয়? মহিষ কালী? ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? ঠিক করে লেখো, জোজো কোথায় আছে?"

লোকটি আবার গোটা-গোটা করে লিখল, "কক শেস বা জাড়।"

কাকাবাবু আবার বিরক্তভাবে বললেন, "এ কী অদ্ভুত কথা? কোনও মানেই হয় না। বাংলা অক্ষরেই তো লিখেছ, এটা কী ভাষা?"

লোকটির হাত থেকে কলমটা খসে গেল, মাথাটা নিচু হতে হতে ঢুকে গেল টেবিলে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কাকাবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "এখন আর কিছু করা যাবে না। ওকে পাশের ঘরে শুইয়ে দাও!"

অর্ক দারুণ অবাক হয়ে বলল, "ওরকম একটা তেজি লোককে আপনি ঘুম পাড়িয়ে দিলেন? এরকমভাবে হিপনোটাইজ করা যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলেই তো যে যায়! একটা হাতিকেও আমি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। বাঘকে পারব না। বাঘ আগেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!"

অর্ক জিজ্ঞেস করল, "আমাকে পারবেন? করুন তো!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই ক্ষমতাটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। একটু ভুল হলে আমি নিজেই মারা পড়ব!"

অর্ক মনের ভুলে পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করে

ধরাতে গিয়ে কাকাবাবুকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আবার পকেটে ভরে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস থাকলে খেতে পারো। আমার সামনে লজ্জার কিছু নেই। তবে, একটু দূরে বসে খেয়ো, ধোঁয়ার গন্ধটা আমার এখন খারাপ লাগে। এককালে নিজে খুব চুরুট খেতাম।"

অর্ক বলল, "না, এখন খাব না। জানেন কাকাবাবু, আমি এখানে খোঁজখবর নিয়ে বেশ কিছু অদ্ভুত খবর পেলাম। সেই মুখোশধারী ম্যাজিশিয়ানকে মেলার সময় কয়েকজন দেখেছিল, তারপর আর কেউ দেখেনি। আপনি ঠিকই শুনেছেন, সে একটা লঞ্চে থাকত। এখানে নাকি বাংলাদেশ, বার্মা থেকে কিছু-কিছু লঞ্চ সমুদ্রের ধার দিয়ে-দিয়ে প্রায়ই আসে। এখান থেকেও কিছু লঞ্চ ওইসব দেশে যায়। ভিসা, পাসপোর্টের কোনও ব্যাপার নেই। নানারকম জিনিসের চোরাচালান হয়। এদিকটায় পুলিশের তেমন নজর নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "এইদিক দিয়েই তো বড়-বড় বিদেশি জাহাজ কলকাতা আর হলদিয়া বন্দরে যায়?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, সেইসব জাহাজ থেকেও অনেক চোরাই জিনিসপত্র নামিয়ে দেয় এখানে। এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঘরে বসে থেকে কী হবে, চলো সবাই মিলে সমুদ্রের ধারটা একবার ঘুরে আসি।"

টাক-মাথা লোকটাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরে। প্রফুল্ল নামে একটা লোক বাংলোটা দেখাশুনো করে, তাকে ডেকে বলা হল, "দরজা বন্ধ করে রাখো। ওই লোকটার ওপর নজর রাখবে।"

টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী হিজিবিজি লিখেছে, মাথামুণ্ডু নেই! মহিষ কালী! মহিষের সঙ্গে কালীর কী সম্পর্ক? তারপর কক শেস বা জাড়, এটা তো মনে হচ্ছে বাংলাই নয়!"

কাগজটা কাকাবাবু পকেটে পুরে নিলেন।

অর্ক সন্তুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "জোজোর অভাবে সন্তু একেবারে মুষড়ে পড়েছে। কোনও কথাই বলছে না!"

সন্তু ফ্যাকাসে ভাবে একটু হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "সামনাসামনি যদি কোনও শত্রু আসে, তা হলে সন্তু জানে কী করে লড়াই করতে হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তো কে যে শত্রু তা বোঝাই যাচ্ছে না। জোজোর বদলে যদি সন্তুকে অদৃশ্য করে দিত, তা হলে আমার এত চিন্তা হত না। সন্তু ঠিক বেরিয়ে আসত!"

সমুদ্র এখান থেকে বেশি দূর নয়। গাড়িতে গিয়ে লাভ নেই, বালিতে চাকা বসে যাবে। সবাই হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল। ভাটার সময় সমুদ্রের জল অনেকটা সরে যায়। তখন কাদা থিকথিক করে। এখন জল বেশ কাছে। বালির ওপর দৌড়োদৌড়ি করছে অসংখ্য লালরঙের কাঁকড়া। সেগুলো এত ছোট যে, খাওয়া যায় না। এদের ধরাও বেশ শক্ত। একটু দূর থেকে মনে হয় যেন হাজার হাজার কাঁকড়া একটা কার্পেটের মতন বিছিয়ে আছে, কাছে গেলেই সব গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। অলি দৌড়োদৌড়ি করে ধরবার চেষ্টা করল, একটাও পারল না।

তারপর সে এক জায়গায় বসে পড়ে বালি দিয়ে দুর্গ বানাতে লাগল।

কাকাবাবুও ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে, রুমাল পেতে বসে পড়লেন এক জায়গায়। বললেন, "একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে।

সেটা দেখে যাব।”

সন্তু বলল, “একটা লঞ্চ দেখা যাচ্ছে ওই যে!”

অর্ক বলল, “ওটা মাছ ধরার ট্রলার। সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। দূরের দিকে চেয়ে দ্যাখো, আরও দু-তিনটে লঞ্চ রয়েছে। ওগুলো কাদের কে জানে! এবার এদিকটায় টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।”

কিছু-কিছু জেলেদের নৌকোও রয়েছে। এক-একজন জেলে জাল কাঁধে নিয়ে ফিরছে। এক জায়গায় বালির ওপর কয়েকজন কাঠকুটো জ্বেলে গোল হয়ে বসে আছে। সন্তু সেইদিকে হেঁটে গেল।

অলি বেশ বড় একটা দুর্গ বানিয়েছে। তারপর আর-একটা কিছু বানাতে গিয়ে থেমে গিয়ে বিভোর হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। একসময় সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, “অর্ককাকু, এই সমুদ্রে দ্বীপ আছে?”

অর্ক বলল, “হ্যাঁ। সুন্দরবনের দিকে অনেক দ্বীপ আছে। তারপর যদি আন্দামান-নিকোবরের দিকে যাও, সেখানে কয়েক শো দ্বীপ!”

অলি বলল, “আমি একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি।”

অর্ক বলল, “কই? আমরা তো পাচ্ছি না!”

অলি বলল, “আমি মাঝে-মাঝে দেখছি, আবার দেখছি না। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।”

অর্ক কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, “এখান থেকে তো কোনও দ্বীপ দেখা যায় না? ও দেখছে কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “ও-মেয়েটা ওরকমই। আমরা যা দেখি, তার চেয়ে ও কিছুটা বেশি দ্যাখে। তাই নিয়ে ও নিজের মনে থাকে।”

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেছে, সূর্য নেমে গেছে অনেক নীচে। সমুদ্রের জলেও লাল আভা। একটা বড় জাহাজ এগিয়ে আসছে গভীর সমুদ্রের দিক থেকে, সেটাকে মনে হচ্ছে ছবিতে আঁকা জাহাজ। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে।

অর্ক বলল, "কাকাবাবু, একবার ওই কাগজটা আমাকে দিন তো!"

কাগজটা নিয়ে একদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু অর্থ উদ্ধার করতে পারলে নাকি?"

অর্ক বলল, "মহিষ কালী মানে কী তা আমি ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য লেখাটা যতবার উচ্চারণ করছি, একটা জায়গার নাম আমার মনে আসছে।"

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "তাই নাকি? কী নাম বলো তো?"

অর্ক বলল, "ধরা যাক লোকটা লেখাপড়া প্রায় কিছুই শেখেনি। যুক্তাক্ষর লিখতে জানে না। আপনি হিপনোটাইজ করেছিলেন, সেই ঘোরের মধ্যে অনেক বানান ভুল করেছে। এই সব ধরে নিলে অক্ষরগুলো নিয়ে একটা নাম তৈরি হয়। কক্সেসবাজার!"

কাকাবাবু বললেন, "কক্সেসবাজার? সে তো বাংলাদেশের প্রায় শেষ প্রান্তে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট শহর।"

অর্ক বলল, "কক্স সাহেবের নামে বাজার, তাই কক্সেসবাজার। কেউ-কেউ শুধু কক্সবাজারও বলে। যেমন আমাদের ফ্রেজারগঞ্জ!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই তুবরক কি বলতে চায় যে জোজোকে

কক্সেসবাজারে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে?"

অর্ক বলল, "তাই তো বোঝায়?"

কাকাবাবু বললেন, "বাংলাদেশে কি মানুষ কম পড়েছে? সেখানে শুধু-শুধু একটা সতেরো বছরের ছেলেকে নিয়ে যাবে কেন? উদ্দেশ্যটা কী?"

অর্ক বলল, "ঠিক বলেছেন, উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলে অন্য সব কিছু সহজ হয়ে যায়। উদ্দেশ্যটি বোঝা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "দ্বিতীয় লেখাটা যদি কক্সেসবাজার হয়, তা হলে প্রথম লেখাটারও একটা মানে বার করা যায়। মহিষ কালী নয়, মহেশখালি! কক্সেসবাজারের কাছে মহেশখালি নামে একটা বড় দ্বীপ আছে আমি জানি। সেখানে একটা পুরনো মন্দির আছে। অনেকদিন আগে আমি গিয়েছিলাম। ওই অঞ্চলের লোকেরা 'খ'-কে 'ক'-এর মতন উচ্চারণ করে। মহেশ হয়ে গেছে মহিষ। মহেশখালি!"

অর্ক বলল, "তা হলে দুটোরই মানে হয়।"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শিগগির চলো, ডাকবাংলোতে ফিরতে হবে। ওই লোকটাকে আরও জেরা করে কথা বার করতে হবে। সন্তু কোথায় গেল!"

অর্ক সন্তুর নাম ধরে জোরে-জোরে ডাকতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "অলি, উঠে এসো, এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

অলি বলল, "না, আমি এখন যাব না। আর- একটু থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আর থাকা যাবে না। বাংলোতে যাওয়া খুব দরকার।"

অলি বলল, "তোমরা যাও, আমার এখানে খুব ভাল

লাগছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমাকে একলা রেখে যেতে পারি নাকি ? লক্ষ্মী সোনা, চলো, আমরা কাল সকালে আবার আসব !”

অলি বলল, “এখনও অন্ধকার হয়নি, কত রং দেখা যাচ্ছে। সকালটা তো অন্যরকম !”

কাকাবাবু বাংলোয় ফেরার জন্য ছটফট করছেন। অলিকে বোঝানো যাচ্ছে না কিছুতেই। সন্তু কাছে এলে কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তুই অলির কাছে থাক। একটু পরেই চলে আসিস। বেশি দেরি করিস না।”

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন বাংলোর দিকে। গাড়িটা রয়েছে বাংলোর সামনে, ড্রাইভার আর কনস্টেবলটি ঘুমোচ্ছে তার মধ্যে।

বসবার ঘরে ঢুকেই অর্ক বলে উঠল, “এ কী !”

মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে প্রফুল্ল, তার মাথায় থকথকে রক্ত। অর্ক তার পাশে বসে পড়ে আস্তে-আস্তে তার শরীরটা উলটে দিল।

কাকাবাবু পাশের ঘরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “পাখি উড়ে গেছে !”

সে-ঘরের দরজা খোলা। টাক-মাথা লোকটা নেই। পড়ে আছে তার হাত-বাঁধা দড়িটা।

অর্ক প্রফুল্লর বুকে হাত দিয়ে বলল, “বেঁচে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে, কেউ ওর মাথায় ভারী কিছু জিনিস দিয়ে মেরেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “ছি ছি, আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।”

অর্ক বলল, “টাকলুটাকে আমি নিজে হাত বেঁধেছি। সে-বাঁধন সে খুলবে কী করে ? নিশ্চয়ই আর একজন কেউ এসেছিল ওকে

সাহায্য করতে।”

কাকাবাবু হঠাৎ অস্থিরভাবে বললেন, “অলি ! অলিকে রেখে এসেছি, ওর যদি কোনও বিপদ হয় ? এক্ষুনি যেতে হবে।”

অর্ক ড্রাইভার আর কনস্টেবলটিকে ডেকে তুলল। তাদের ধমকে বলল, “তোমরা এই সন্ধেবেলা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিলে, ভেতরে কী কাণ্ড হয়ে গেল জানো না !”

তারা কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে রইল।

কনস্টেবলটিকে রেখে যাওয়া হল প্রফুল্লকে দেখাশুনো করার জন্য। কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। অলি ঠিক তার আগের জায়গাটাতেই বসে আছে। সেখানে সন্তু নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “অলি, অলি, সন্তু কোথায় ?”

অলি আঙুল তুলে একটা দিকে দেখিয়ে বলল, “সন্তুকে ধরে নিয়ে যাবে !”

ডান দিকে, অনেকটা দূরে দুটি ছায়ামূর্তি দৌড়োদৌড়ি করছে। তাদের মধ্যে একজন সন্তু, অন্যজন বেশ লম্বা। ঠিক যেন চোর-চোর খেলছে। লম্বা মূর্তিটা একবার সন্তুকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে, সন্তু পেছনে সরে যাচ্ছে।

অলি বলল, “ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।”

কাকাবাবু অলিকে দেখেই নিশ্চিন্ত হলেন, তার পাশে গিয়ে হাতটা ধরলেন। সন্তুর জন্য তাঁর চিন্তা নেই। ওইরকম ভাবে কেউ সন্তুকে ধরতে পারবে না। অন্য লোকটির গায়ে যতই জোর থাকুক, সন্তু দারুণ ক্ষিপ্র।

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু বালির ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতেও পারবেন না, অর্ক ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু বেশি ব্যস্ত হয়ে সে ভুল করে ফেলল। কাছে গিয়ে লোকটিকে ধরে ফেলা উচিত

ছিল। একবার সেই লম্বা ছায়ামূর্তিটা সন্তুকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে দেখে অর্ক তার রিভলভার ওপরের দিকে তুলে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই মূর্তিটা সন্তুকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল জলের দিকে, সেখানে কয়েকটা মাছ-ধরা নৌকোর আড়ালে আর তাকে দেখা গেল না।

রিভলভার উঁচিয়ে অর্ক সেদিকে গিয়ে লোকটাকে খুঁজল। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না কিছুতেই। সে কি জলে নেমে গেছে? ওদের কাছে টর্চ নেই, এর মধ্যে আরও অন্ধকার হয়ে গেল।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন অলির হাত ধরে। ওই লোকটা যে-ই হোক, সে অলিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। অথচ সেটাই সহজ ছিল। সন্তুকে ধরার চেষ্টা করছিল কেন?

লোকটিকে খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে অর্ক আর সন্তু ফিরে আসবার পর অলি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "সন্তু, তুমি ইচ্ছে করে ধরা দিলে না কেন? তা হলে বেশ ভাল হত! জোজো যেখানে আছে, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যেত। তোমরা দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকতে!"

এর পর পাঁচদিন কেটে গেল, তবু জোজোর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তার মুক্তিপণ দাবি করে কোনও চিঠিও এল না। জোজো যেন সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সার্কাসের ম্যানেজার জহুরুল আলম ধরা পড়ে গেছে বজবজের

কাছে। তাকে অনেক জেরা করেও লাভ হল না কিছু। লোকটি জেদি ধরনের, চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে। অনেক বছর ধরে সে সার্কাস চালাচ্ছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত পুলিশের খাতায় তার নাম ওঠেনি। সে বারবার বলতে লাগল, "আমার কাছে কত ছেলে এসে কাজ চায়, চাকরি চায়, আমি শুধু-শুধু একটা ছেলেকে লুকিয়ে রাখব কেন?"

সার্কাসের অন্য লোকেরাও সাক্ষী দিল যে, ম্যাজিশিয়ান এক্স তাদের দলের কেউ নয়। সে একজন সহকারী নিয়ে কাকদ্বীপেই ম্যাজিক দেখাবার জন্য যোগ দিয়েছিল। সে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।

যে-লোকটি বাঘের খেলা দেখায়, তার জ্বর হয়েছিল। বাঘগুলোকে খাঁচায় ভরে লরিতে তোলার সময় তার উপস্থিত থাকার কথা, কিন্তু সে থাকতে পারেনি সেদিন। তার ধারণা, কেউ ইচ্ছে করেই একটা বাঘের খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিল।

ঘুমপাড়ানি গুলি খাইয়ে কাবু করার পর সেই বাঘটাকে এখন রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। তাকে আর সার্কাস দলে ফেরত পাঠানো হবে না।

জোজোর বাবা ফিরে এসেছেন কাশী থেকে। সন্তু আশা করেছিল, তিনি একটা যজ্ঞিডুমুরে মন্ত্র পড়ে ছুড়ে দেবেন, অমনই সেটা গড়াতে- গড়াতে গিয়ে খুঁজে বার করবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। কাকাবাবু আর সন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করায় তিনি বললেন, "তোমাদের কোনও দোষ নেই। আমি জানতাম, এক সময় এরকম একটা কিছু হবেই। অনেকদিন ধরেই ওরা জোজোকে নিজেদের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করছে। আমাকে জব্দ করার ফন্দি, বুঝলেন তো!"

কাকাবাবু খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা মানে

কারা ? জোজোকে কারা আটকে রেখেছে আপনি জানেন ?"

জোজোর বাবা আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "জানি। পুলিশের সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বার করার। আমার সঙ্গেই ওদের বোঝাপড়া হবে।"

কাকাবাবু বিনীতভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক কী আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ? কারা এবং কীজন্য জোজোকে ধরে নিয়ে যাবে ?"

জোজোর বাবা বললেন, "নেপালের দিকে হিমালয়ে কালী মহিষানি নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে একদল সাধু থাকে, তাদের বলে হিঙ্গুরানি সম্প্রদায়। ওদের যে হেড, সেই দুসেরিবাবার সঙ্গে আমার একবার খুব তর্ক হয়েছিল। দুসেরিবাবার নামের মানে তিনি প্রত্যেকদিন দু' সের চাল, অর্থাৎ প্রায় দু' কেজি চালের ভাত খান। দু' কেজি চালে এইরকম পাহাড়ের মতন ভাত হয় থালার ওপর, তিনি অনায়াসে খেয়ে নিতেন, যদিও চেহারাটা রোগা পাতলা। সেই দুসেরিবাবার সঙ্গে আমার শাস্ত্র নিয়ে তর্ক হয়, তিনি হেরে যান। সেখানে অনেক পণ্ডিত ছিল, তাদের সামনে হেরে গিয়ে দুসেরিবাবা খুব অপমানিত বোধ করেন। তর্ক কিন্তু আমি শুরু করিনি। আমি তর্ক করতে ভালও বাসি না। সেই থেকে হিঙ্গুরানি সাধুরা আমার ওপর খুব চটে আছে। আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করছে। ওরাই জোজোকে ধরে রেখেছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই হিমালয় থেকে সাধুরা এসে জোজোকে ধরবে কী করে ?"

জোজোর বাবা বললেন, "ওরা তো গঙ্গাসাগর মেলার সময় স্নান করতে আসে। কিছুদিন থেকে যায়। কাকদ্বীপের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে নিশ্চয়ই। তবে ওই সাধুরা খুনি নয়,

জোজোকে মেরে ফেলবে না। সে ভয় নেই। আমাকেও ওখানে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই সাধুদের আপনার ওপর রাগ আছে বুঝলাম। কিন্তু অন্য কোনও দলও তো জোজোকে ধরে রাখতে পারে।"

জোজোর বাবা হেসে বললেন, "একটা সতেরো বছরের ছেলেকে শুধু-শুধু কে ধরে রাখতে যাবে বলুন! আমি বড়লোক নই, আমার কাছ থেকে টাকা-পয়সাও পাবে না। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি চিন্তা করবেন না। জোজোকে আমিই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব।"

জোজোর মা অবশ্য এসব কথা মানছেন না। তিনি কান্নাকাটি শুরু করেছেন।

সে বাড়ি থেকে বেরোবার পর সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই সাধুরা যেখানে থাকে, সেই জায়গাটার নাম কালী মহিষানি। টাক মাথা লোকটা লিখেছিল মহিষ কালী। দুটোতে মিল আছে না!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ! আর পরের লেখাটা!"

সন্তু বলল, "ওখানে ওই নামে কোনও বাজার থাকতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "সব গুলিয়ে যাচ্ছে। একদিকে হিমালয়, আর একদিকে বাংলাদেশের একটা ছোট শহর। । কক্সেসবাজারে একবার যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেখানকার পুলিশ আমাকে চেনে না, তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাব না..."

সন্তু বলল, "ম্যাজিশিয়ানের মুখে মুখোশ ছিল, সেটা খুলে ফেললে তাকে চেনবার কোনও উপায় নেই। আর তার অ্যাসিস্ট্যান্টের মাথায় একটাও চুল নেই, ভুরু নেই। সে যদি পরচুলা পরে নেয়, আর নকল ভুরু লাগায়, তা হলে তারও চেহারা

একেবারে বদলে যাবে। এরা এখন আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ালেও বুঝতে পারব না।"

কাকাবাবু বললেন, "টাক-মাথা লোকটাকে পালাতে দেওয়াটা চরম ভুল হয়ে গেছে। ওর পেট থেকে আমি সব কথা বার করে আনতাম! চল, একবার অসীম দত্তর বাড়ি যাই। নতুন কোনও খবর পাওয়া যায় কি না!"

দরজা খুলে দিল অলি। কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখে তার মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে পরে আছে একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট, মাথার চুলে রিবন বাঁধা। চোখ গোল-গোল করে ফিসফিসিয়ে বলল, "কাকাবাবু, আমি জোজোকে আবার দেখেছি!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? কখন দেখলে? স্বপ্নে?"

অলি বলল, "না, জেগে-জেগে। একটা সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, একটু পরে হঠাৎ দেখতে পেলাম। একেবারে স্পষ্ট। এবারে জোজোকে চিনতেও পেরেছি।"

"কী করে চিনলে?"

"বাবার কাছে এখন জোজোর ছবি আছে। সেই ছবি আমি দেখেছি তো, ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।"

"কোথায় দেখলে? সেই অন্ধকার ঘরে?"

"না, না, এবার অন্য জায়গায়। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ, সেই দ্বীপে কোনও মানুষ নেই, একেবারে ফাঁকা, সেই দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত বড় বাড়ি, সাদা রঙের বাড়ি, অনেক ঘর, সেই বাড়ির একটা ঘরে রয়েছে জোজো!"

সন্তু হোহো করে হেসে উঠল।

অলি রাগ-রাগ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, তুমি হাসলে যে?"

সন্তু বলল, "তোমার নাম রূপকথা, তুমি সত্যিই নতুন-নতুন রূপকথা বানাও!"

অলি বলল, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

সন্তু বলল, "যে দ্বীপে একটাও মানুষ থাকে না, সেখানে অতবড় একটা বাড়ি কে বানাবে?"

অলি তবু জোর দিয়ে বলল, "কে বানিয়েছে জানি না, কিন্তু ওরকম বাড়ি সত্যিই আছে। আমি দেখেছি।"

সন্তু বলল, "সেখানে আর কেউ থাকে না। শুধু জোজো একা?"

অলি বলল, "জোজো ছাড়া আর কোনও লোক দেখিনি। জোজো ঘুমিয়ে আছে।"

সন্তু মুচকি হেসে বলল, "ঘুমন্ত রাজপুত্তুর। সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি বদল করে তাকে জাগাতে হবে।"

কাকাবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "অলিদিদি, পৃথিবীতে অনেক সমুদ্র আছে। হাজার-হাজার দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটা কোথায় বলতে পারো?"

অলি আস্তে-আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, "না। তা জানি না। আমি দেখলাম ধু ধু করছে সমুদ্র, মাঝখানে একটা দ্বীপ—"

সন্তু বলল, "সমুদ্র কখনও ধু ধু করা হয় না। ধু ধু করা মাঠ, ধু ধু মরুভূমি হয়। বাংলাও জানো না!"

অলি বলল, "সমুদ্র তা হলে কী হয়?"

সন্তু বলল, "বলতে পারো অকূল সমুদ্র। কিংবা, 'জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল'!"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ওসব কথা এখন থাক। অলি, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?"

এই সময় অসীম দত্ত ঘরে এসে বললেন, "অলি তোমাদের

সেই স্বপ্ন দেখার গল্পটা বলেছে ? এ-মেয়েটাকে নিয়ে যে কী করি ! জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখে !"

কাকাবাবু বললেন, "ভালই তো। কত লোক স্বপ্ন দেখে মনেই রাখতে পারে না ! অসীম, আর কোনও খবর পেলে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "সেরকম কিছু না। বীরভূমে ইলামবাজারের কাছে দুটো লোক একটা ছ' বছরের ছেলেকে চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পাড়ার লোক ওই লোক দুটোকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলত, পুলিশ এসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে। সে-দুটো সাধারণ ছিঁচকে চোর, এর আগেও জেল খেটেছে। এরা কি একই দলের হতে পারে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মনে হয় না। এরকম তো প্রায়ই শোনা যায়।"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি যদি চাও, লোকদুটোকে কলকাতায় আনাতে পারি। তুমি জেরা করে দেখতে পারো। কিংবা, তুমি বীরভূমে যাবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদেরই বরং কলকাতায় আনাও।"

তারপর চা খেতে-খেতে কিছুক্ষণ গল্প হল। এক সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

অসীম দত্ত রিসিভার তুলে বললেন, "ইয়েস, অসীম দত্ত স্পিকিং... কে ? সিরাজুল চৌধুরী ? কী খবর সিরাজুল, অনেক দিন পর... কার ছেলে ? কী হয়েছে ? ...কবে হল ? ...ডিটেইল্‌স দাও তো... ভেরি স্ট্রেঞ্জ, আমাদের এখানেও এরকম হয়েছে..."

প্রায় দশ মিনিট কথা বলার পর অসীম দত্ত টেলিফোন ছাড়লেন। কাকাবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "অদ্ভুত, অদ্ভুত ! কে ফোন করেছিল জানো ? সিরাজুল চৌধুরী, আমার অনেকদিনের বন্ধুমানুষ, বাংলাদেশের পুলিশের একজন

বড়কর্তা, সে আমাকে একটা অনুরোধ জানাল। ব্যাপার হয়েছে কী, ঠিক জোজোর মতনই বাংলাদেশে একটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "তার বয়েস কত ?"

অসীম দত্ত বললেন, "সতেরো বা আঠেরো। একজন বড় ব্যবসায়ীর ছেলে, লেখাপড়াতেও ভাল। ব্যাপারটা নিয়ে ওখানে খুব হইচই পড়ে গেছে। ছেলেটির নাম রশিদ হায়দার, ডাকনাম নিপু।"

"কী করে অদৃশ্য হল ?"

"ওই একই ভাবে। চট্টগ্রাম শহর থেকে খানিকটা দূরে এক জায়গায় ম্যাজিক দেখানো হচ্ছিল। মানুষ অদৃশ্য করার ম্যাজিক। ওই নিপু বিজ্ঞানের ছাত্র, সে বিশ্বাস করেনি। উঠে গিয়ে বলেছিল, আমাকে অদৃশ্য করুন দেখি। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর ফিরে আসেনি।"

"সেই ম্যাজিশিয়ানের মুখে মুখোশ ছিল ?"

"সেটা জিজ্ঞেস করিনি। পরের দিন যখন ছেলেটির খোঁজ পড়ল, ততক্ষণে ম্যাজিশিয়ান তাঁবু গুটিয়ে সরে পড়েছে। ছেলেটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না, ম্যাজিশিয়ানও ধরা পড়েনি।"

"তোমাকে ফোন করে জানাল কেন ? তোমার কাছে পরামর্শ চাইছে ?"

"না, তা নয়। সিরাজুলের ধারণা, ওই ম্যাজিশিয়ানটি ইন্ডিয়ান। কিংবা তা যদি নাও হয়। ওই ছেলেটাকে স্মাগ্‌ল করে পশ্চিমবাংলায় আনা হয়েছে। একদল ক্রিমিনাল বাংলাদেশ থেকে ছেলেমেয়েদের ধরে-ধরে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসে। এখানকার কিছু ক্রিমিনালদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। সেইসব

ছেলেমেয়ে এখান থেকে বম্বে নিয়ে গিয়ে আরব দেশে পাচার করে দেয়।"

"হ্যাঁ, এরকম শুনেছি। কিন্তু সে তো ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ভিক্ষে করায় কিংবা উটের পিঠে চাপিয়ে দৌড় করায়।"

"বড়-বড় ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে গিয়ে ধনী শেখদের বাড়িতে কাজ করায়। একবার কোনও বাড়িতে ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। এরকম ক্রিমিনালদের গ্যাং আগে এখানে ধরাও পড়েছে। সিরাজুল আমাকে অনুরোধ করল, যে-কোনও উপায়ে নিপুকে খুঁজে বার করতেই হবে। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, জোজোকেও আরব দেশে পাঠিয়ে দেয়নি তো?"

অলির দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "ধু ধু করছে মরভূমি, তার মধ্যে একটা সাদা বাড়ি, এটা হতেও পারে।"

অলি জোর দিয়ে বলল, "না, আমি সমুদ্রই দেখেছি!"

কাকাবাবু বললেন, "কালই আমি চট্টগ্রাম যাব। তুমি সিরাজুল চৌধুরীকে একটা খবর দিয়ে দাও!"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি চট্টগ্রামে গিয়ে কী করবে? বরং ওই ক্রিমিনালদের একটা ঘাঁটি আছে দমদমের দিকে, খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে একবার রেড করে দেখলে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব কাজ তুমি করো। আমি চিটাগাং একটু বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন বাংলাদেশে যাইনি। সন্তুও যাবে আমার সঙ্গে।"

অলি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আমিও যাব!"

অসীম দত্ত বললেন, "এই রে!"

কাকাবাবু সস্নেহে অলির মাথায় হাত রেখে বললেন, "সেখানে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেটা অন্য দেশ, সেখানে

যেতে পাসপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে।"

অলি ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলল, "ওসব জানি না। আমি যাবই। জানি, কাকাবাবু ওখানে জোজোকে খুঁজতে যাচ্ছেন!"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, শোনো অলি, জোজোর বাবা বলেছেন তিনিই জোজোকে খুঁজে বার করবেন। আমাদের আর দায়িত্ব নেই। বাংলাদেশে আমি বেড়াতেই যাচ্ছি।"

অলি বলল, "ওসব আমি বুঝি। আমাকে ঠকানো হচ্ছে। আমার পাসপোর্ট করে দাও, আমি যাব!"

অসীম দত্ত বললেন, "কী পাগলামি করছিস অলি? পাসপোর্ট কি সহজে হয় নাকি? অনেকদিন লাগে। শুধু-শুধু জেদ করে লাভ নেই।"

এবার অলির চোখে জল এসে গেছে। সে বলল, "ওই সন্তুর পাসপোর্টটা আমাকে দিয়ে দাও। ও যাবে না, ওর বদলে আমি যাব।"

অসীম দত্ত আর সন্তু হেসে উঠল।

অসীম দত্ত বললেন, "সব পাসপোর্টে ছবি থাকে। অন্যের পাসপোর্ট নিয়ে গেলে কী হয় জানিস না? পুলিশ ক্যাঁক করে ধরে জেলে পুরে দেবে।"

অলি বলল, "স্মাগলাররা যে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসে, তাদের তো পাসপোর্ট থাকে না? আমিও সেইভাবে যাব!"

অসীম দত্ত বললেন, "আরে স্মাগলাররা বেআইনি কাজ করে, আমরা কি তা করতে পারি? অবুঝ হোসনি লক্ষ্মীটি!"

অলি এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

কাকাবাবুর তা দেখে খুব কষ্ট হল। তিনি বললেন, "অলি, এবারে সত্যিই তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে, আমি

কথা দিচ্ছি, এর পর আমি যেখানে যাব, তোমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমার পাসপোর্ট করিয়ে রাখবে।"

অলি এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, "অকূল সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ, তার মাঝখানে একটা সাদা বাড়ি..."

দুপুরের মধ্যেই ভিসা আর টিকিট হয়ে গেল, সন্ধেবেলা প্লেন। মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে কলকাতা থেকে চিটাগাং যেতে। ছোট্ট এয়ারপোর্ট, সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন সিরাজুল চৌধুরী। বেশ বড়সড় চেহারা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, দেখলেই জবরদস্ত পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়।

তিনি কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আসুন, আসুন রায়চৌধুরী সাহেব। এই প্রথম চিটাগাং এলেন, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম!"

কাকাবাবু বললেন, "আগেও এসেছি, কেউ জানতে পারেনি। এবারেও কাউকে জানাবেন না। এই আমার ভাইপো সন্তু!"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না। তবে আমার ছেলেমেয়েরা আপনাদের কথা জানে। তারা এই সন্তুর খুব ভক্ত। তারা ঢাকায় আছে, একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।"

গাড়িতে ওঠার পর তিনি আবার বললেন, "নিপুর কোনও খোঁজ পেলেন? আমার দৃঢ় ধারণা, তাকে কলকাতাতেই নিয়ে

গেছে। বম্বেতেও চালান করে দিতে পারে। ও, আপনারা তো এখন বম্বেকে মুম্বই বলেন তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম দত্ত সেসব ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। কক্সেসবাজার যাব, সেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে?"

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, "অনেক জায়গা আছে। সুন্দর ব্যবস্থা। গিয়ে দেখবেন, সে-শহরের কত বদল হয়ে গেছে। এখানেও আপনাদের জন্য গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করেছি। অসীম যদি নিপুকে উদ্ধার করে ফেরত পাঠাতে পারে, তবে বড়ই কৃতজ্ঞ হব। এখানে আপনারা যা সাহায্য চান, পাবেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যে ম্যাজিশিয়ানের খেলা দেখতে গিয়ে নিপু নামের ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার মুখে কি মুখোশ ছিল?"

সিরাজুল সাহেব চমকে উঠে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে? হ্যাঁ, সে একটা মুখোশ পরে ছিল, অনেকটা কমিকসের ফ্যান্টমের মতন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তার একজন সহকারী ছিল কি, যার মাথায় একটাও চুল নেই, ভুরুও নেই!"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "সেরকম কিছু রিপোর্ট পাইনি। সহকারীর কথা কেউ বলেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে আর কোনও ছেলে হারাবার খবর পাওয়া গেছে কি?"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "দেশে এত মানুষ, কিছু-কিছু হারিয়ে যায়, সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে পুলিশে খবরও দেয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "তবে ম্যাজিক দেখিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেদের উধাও করার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে, তাই

না ?”

সিরাজুল সাহেব বললেন, “চোরেরা এই কায়দাটা কেন নিয়েছে জানেন ? রাস্তাঘাট থেকে ছেলে-মেয়ে চুরি করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। আর ধরা পড়লেই লোকের হাতে মার খেতে-খেতে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। ম্যাজিক দেখিয়ে অদৃশ্য করলে সে ভয় নেই। লোকে ভাববে ম্যাজিকের খেলা, একটু পরে ফিরে আসবে। কিংবা ছেলেটা ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক বলেছেন। এইজন্যই বাচ্চাদের বদলে বড় বয়েসের ছেলেদের নিচ্ছে, যারা ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকতে পারে। যাদের নিয়ে কেউ প্রথমেই বেশি চিন্তা করে না।”

কথা বলতে-বলতে গাড়িটা পৌঁছে গেল গেস্ট হাউসে। বড়-বড় গাছপালায় ঘেরা সেই বাড়িটিকে বাইরে থেকে দেখাই যায় না। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার পর সামনে চওড়া বারান্দা, পাশাপাশি অনেক ঘর।

সিরাজুল চৌধুরী লোকজনদের ডেকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কাকাবাবুকে বললেন, “আপনাদের এখানে কোনও অসুবিধে হবে না, যা দরকার হয় চাইবেন। রায়চৌধুরী সাহেব, আপনার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে পারলে আমার ভাল লাগত খুব। কিন্তু তার উপায় নেই, আমায় কালই ঢাকায় যেতে হবে বিশেষ কাজে। আমার দু'জন অফিসার আপনাদের দেখাশুনো করবে।”

কাকাবাবু বললেন, “না, না, আপনি ব্যস্ত মানুষ আমি জানি। আমাদের দেখাশুনো করবার দরকার নেই। শুধু কক্সেসবাজারে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিলেই হবে। আমি মহেশখালির পুরনো মন্দিরটা একবার দেখতে যাব।”

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, “কাল সকালেই আপনাদের জন্য একটা গাড়ি আসবে। সে-গাড়িটা যতদিন খুশি সঙ্গে রাখবেন। সব জায়গায় নিয়ে যাবে।”

সিরাজুল সাহেব চলে যাওয়ার পরই গেস্ট হাউসের ম্যানেজার দু'টি বড়-বড় প্লেটে ভর্তি নানারকম খাবার নিয়ে এলেন। তাতে কচুরি-শিঙাড়া থেকে শুরু করে অনেকরকম কেক-পেস্ট্রি সাজানো রয়েছে।

সন্তু বলল, “এত খাবার কী করে খাব ?”

কাকাবাবু বললেন, “বাংলাদেশের মানুষরা খুব খাওয়াতে ভালবাসে। কাল থেকে দেখবি, যার সঙ্গে আলাপ হবে, সে-ই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে চাইবে। কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন মানেই পাঁচ-ছ'রকমের মাছ আর তিন-চাররকমের মাংস থাকবেই।”

সন্তু শুধু একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে কামড় দিল। তার মনে হল, জোজো খেতে ভালবাসে, সে এখানে থাকলে খুশি হত! জোজোকে এদিকে কোথাও ধরে রেখেছে, না আরব দেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে ? কিংবা সে আছে হিমালয়ে ?

হঠাৎ সন্তুর চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। জোজো কি চিরকালের মতন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?

রাত্তিরবেলা ডিনারের সময়ও প্রচুর খাবার দেওয়া হল। কাকাবাবু বা সন্তু কেউই বেশি খেতে পারে না। জোজোর কথা বেশি করে মনে পড়ায় সন্তুর আজ কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।

গেস্ট হাউসটাতে অনেক ঘর, কিন্তু আর কোনও ঘরে লোক নেই। কর্মীরা থাকে পেছনের দিকে। রাস্তায় কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দও শোনা যায় না। দশটার মধ্যে চতুর্দিক একেবারে সুনসান।

কাকাবাবু বারান্দাটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে ঘরে এসে ভাল করে দরজা বন্ধ করলেন। রিভলভারটা বালিশের নীচে রেখে বললেন, "রাতটা একটু সাবধানে থাকিস সন্তু। রাত্তিরে কিছুতেই ঘরের বাইরে যাবি না।"

আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর সন্তুই ঘুমিয়ে পড়ল আগে।

সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল কিছু একটা ঠাণ্ডা জিনিসের ছোঁয়ায়। তার কপালে কেউ যেন এক চাঙড় বরফ রেখেছে। সে সেখানে হাত দিতেই টের পেল, বরফ নয়, কারও হাত। অসম্ভব ঠাণ্ডা, মানুষের হাত এত ঠাণ্ডা হতে পারে না। তারপরই একটা ঘ-র-র ঘ-র-র শব্দ পেল। তার শিয়রের কাছে একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখদুটো ঠিক টর্চের আলোর মতন জ্বলছে। ঘরের দরজা বন্ধ, তবু এই লোকটা কী করে ঢুকল ? মানুষ নয়, ভূত ? ধুত ! সন্তু ভূত বিশ্বাস করে না। ভূত বলে কিছু নেই। তবে কি অন্য গ্রহের প্রাণী ? তাই-ই হবে নিশ্চয়ই, মানুষের চোখ ওইরকম ভাবে জ্বলে না।

এইবার সেই প্রাণীটা সন্তুর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তার হাতে অসম্ভব জোর। সন্তু ছাড়িয়ে নিতে পারল না নিজেকে। কাকাবাবুকে সে ডাকতেও পারছে না, গলা শুকিয়ে গেছে।

সেই প্রাণীটা তাকে দরজার কাছে নিয়ে যেতেই দরজাটা খুলে গেল আপনা থেকে। বাইরে এসে সন্তু দেখল, বারান্দার নীচে বাগানে বনবন করে ঘুরছে একটা আলোর মালা। তার নীচে একটা পালকির মতন জিনিস, ভেতরে বসার জায়গা, তা-ও অনেক রঙের আলো দিয়ে সাজানো। এটা কি একটা ছোট্ট হেলিকপ্টার, না মহাকাশযান ?

এবার সেটার পেছন থেকে বেরিয়ে এল সেই টাক-মাথা

লোকটা। সারা গায়ে চকচকে কোনও ধাতুর পোশাক, মুখটা শুধু বেরিয়ে আছে। এরও চোখ জ্বলজ্বল করছে। ও, এ-লোকটাও তা হলে মহাকাশের প্রাণী ?

সে হাতছানি দিয়ে সন্তুকে ডাকল।

সন্তু এবার চেঁচিয়ে উঠল, "না, যাব না ! আমি যাব না !"

অন্য প্রাণীটা সন্তুকে টানতে লাগল, সন্তু নিজেকে ছাড়াতে পারছে না, ছটফট করছে...

এই সময় তার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। তবু বুঝতে সময় লাগল কিছুটা। সত্যি স্বপ্ন ? হ্যাঁ, সে বিছানাতেই শুয়ে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ। অন্ধকার কিছুটা পাতলা হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

এরকম একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখার কোনও মানে হয় ? সন্তু বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এখনও তার বুক ধকধক করছে।

ভয় পাওয়ার জন্য এখন তার লজ্জা হল। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও আর তার ঘুম এল না। টাক-মাথা লোকটাকে সে অন্য গ্রহের প্রাণী বলে দেখল কেন স্বপ্নে ? সেরকম কেউ এলে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নাকি ? তবে লোকটার হাবভাব বেশ অস্বাভাবিক ঠিকই। বোবা সেজে ছিল। কিন্তু সে বাংলা লিখতে পারে, যতই ভুলভাল বানান হোক !

ক্রমে ভোর হয়ে এল, পাখি ডাকতে লাগল। এখানে অনেক পাখি। জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়ায় সন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। সকালটা কী সুন্দর। এখনও আর কেউ জাগেনি। কাল সন্ধের পর এখানে এসেছে বলে বোঝা যায়নি। এখন দেখা গেল বাগান-ভর্তি নানা জাতের ফুল। অনেক ফুল সন্তু চেনেই না। দুটো হলুদ পাখি এক গাছ থেকে

আর-এক গাছে উড়ে গেল।

এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখতে-দেখতে রাত্তিরের দুঃস্বপ্নটা আস্তে-আস্তে মুছে গেল সন্তুর মন থেকে। কাকাবাবু জেগে ওঠার পর তাঁকে কিছুই বলল না।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার টেবিলে বসতেই একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নেমে এল দু'জন তরুণ অফিসার। কাছে এসে একজন বলল, "আসসালামু আলাইকুম।" আর-একজন বলল, "নমস্কার।" একজনের নাম মুস্তাফা কামাল, আর-একজনের নাম তথাগত বড়ুয়া।

তথাগত বলল, "সার, আপনারা কোথায় যেতে চান বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব। এখানে আশপাশে অনেক দেখবার জায়গা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আপাতত কক্সেসবাজার যেতে চাই। ফেরার পথে চট্টগ্রাম ঘুরে দেখব।"

তথাগত বলল, "তা হলে কামাল আপনার সঙ্গে যাবে। ওটা ওর এলাকা। কাল রওনা হবেন, আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে দু'টি ডাল-ভাত খেতে হবে।"

কামাল বলল, "দুপুরে আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনাদের।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব খাওয়াদাওয়া পরে হবে, আগে বরং কক্সেসবাজার ঘুরে আসি। এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে কাকাবাবু ও সন্তু গাড়িতে চড়ে বসল।

চট্টগ্রাম শহরটি বড় মনোহর। ছোট-ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী, কাছেই সমুদ্র। সেসব কিছুই দেখা হল না, গাড়িটা একটু পরেই শহর ছাড়িয়ে পড়ল ফাঁকা

রাস্তায়।

সন্তু কাকাবাবুর এত ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারল না। কক্সেসবাজার যাওয়া হচ্ছে তো অনেকটা আন্দাজে। টাক-মাথা লোকটা লিখেছিল, মহিষ কালী, সেটা যদি কালী মহিষানি হয়, তা হলে যাওয়া উচিত ছিল হিমালয়ে। কিংবা ওই লোকটা কাকাবাবুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য হিজিবিজি কিছু একটা লিখে দিয়েছে।

রাস্তা বেশ মসৃণ, গাড়িটাও বিদেশি। যাওয়া হচ্ছে আরামে। কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করছিলেন তার বাড়ি কোথায়, কতদিন হল সে চাকরিতে ঢুকেছে, এইসব। এক সময় বললেন, "আচ্ছা কামাল, আমি শুনেছিলাম চিটাগাং-এর লোক এমন ভাষায় কথা বলে, যা বাইরের লোক প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না। এমনকী ঢাকার লোকেরাও বুঝতে পারে না। কিন্তু তোমার কথা তো সব ঠিকঠাক বুঝতে পারছি।"

কামাল হেসে বলল, "আমরা বাইরের লোকের সঙ্গে আজকাল সে-ভাষায় কথা বলি না। নিজেদের মধ্যে বলি। সে-ভাষা শুনলে সত্যিই আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "একটুখানি শোনাও তো।"

কামাল ফরফর করে কী খানিকটা বলল, তার একবর্ণও বোঝা গেল না! কাকাবাবু বললেন, "শুনে তো মনে হল বার্মিজ!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কক্সেসবাজার জায়গাটাকে এখানকার লোক কী বলে?"

কামাল বলল, "কেউ বলে ককস্যাসবাজার, কেউ বলে, কক্শোবাজার।"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "আর মহেশখালিকে কী বলে?"

কামাল বলল, "আমরা মহেশখালিই বলি। ড্রাইভারসাহেব কী

বলেন দেখা যাক। ও ড্রাইভারসাহেব, আপনি মহেশখালি গেছেন ?"

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কী কইলেন সার ? মইশকালি ? হ, গেছি। লঞ্চে যাইতে হয়।"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে আড়চোখে তাকাল। কাকাবাবু বললেন, "চট্টগ্রাম শহরটার নামও কত বদলে গেছে। কেউ বলে চাটগাঁ, সেটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু চিটাগাং শুনলে মনে হয় অন্য নাম। হয়তো আগে চিটাগাং-ই নাম ছিল, তার থেকে শুদ্ধ করে চট্টগ্রাম বানানো হয়েছিল।"

কামাল বলল, "এই রাস্তাটা ধরে সোজা গেলে বার্মা পৌঁছনো যায়। টেকনাফ বলে আমাদের একটা জায়গা আছে, তার পরেই বার্মার বর্ডার।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আর বার্মা বলা যাবে না। নতুন নাম হয়ে গেছে মায়ানমার। কত নামই যে বদলে যাচ্ছে ! ভাগ্যিস কলকাতার নামটা বদলায়নি !"

রাস্তার দু'ধারে মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। কখনও যেতে হচ্ছে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। মধ্যে-মধ্যে ছোট-ছোট গ্রাম। রাস্তা দিয়ে যেসব মানুষজন যাচ্ছে, তাদের অনেকের চেহারা বার্মিজদের মতন।

কক্সবাজার পৌঁছবার মুখে এক জায়গায় কামাল বলল, "ওই দেখুন সমুদ্র !"

রাস্তাটা সেখানে বেশ উঁচু, সেখান থেকে নীল সমুদ্র দেখা যায়। তারপর রাস্তাটা নিচু হয়ে শহরে ঢুকে গেছে। কাকাবাবু বললেন, এ-শহরটা যে চেনাই যায় না ! আমি দশ-বারো বছর আগে এসেছিলাম, তখন ছিল নিরিবিলি ছিমছাম শহর। এখন কত বড়-বড় বাড়ি।"

কামাল বলল, "হ্যাঁ, লোক অনেক বেড়ে গেছে। অনেক টুরিস্ট আসে তাই প্রচুর হোটেল হয়েছে, আরও বানানো হচ্ছে।"

গাড়ি এসে থামল একটা টুরিস্ট লজে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি, দু'পাশে বাগান, কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। ঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্র চোখে পড়ে। বেলাভূমিতে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিনিসপত্র ঘরে রেখে দেওয়ার পর কামাল বলল, "কাকাবাবু, আপনি মহেশখালির মন্দির দেখতে যাবেন বলেছিলেন। আপনাদের জন্য স্পিড বোট রেডি আছে। কখন যেতে চান বলুন ?"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন সওয়া দশটা। দুপুরটা কী করব ? এখনই ঘুরে আসা যাক না !"

কামাল বলল, "অনেকটা সময় লাগবে কিন্তু। দুপুরে খেতে বেশ দেরি হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "একদিন না হয় দেরিতেই খাব। না খেলেই বা ক্ষতি কী ! কী বলিস সন্তু ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, এক্ষুনি যাব।"

কাকাবাবু কামালের কাঁধ চাপড়ে বললেন, "তোমাকেও আজ না খাইয়ে রাখব।"

কামাল হেসে বলল, "আমার অভ্যাস আছে।"

আবার বেরিয়ে পড়া হল। যাওয়ার পথে একটা দোকানে বেশ পুরুষ্টু চেহারার সোনালি রঙের মর্তমান কলা দেখে কাকাবাবুর খুব পছন্দ হয়ে গেল, কিনে নিলেন এক ডজন।

পাকা জেটি এখনও তৈরি হয়নি, একটা সরু লম্বা কাঠের পুলের দু'ধারে অনেক নৌকো, স্পিড বোট, ছোটখাটো লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। কোনও-কোনওটা কাদার ওপর। ভাটার সময় বলে

জল নেমে গেছে। জায়গাটায় খুব মাছ-মাছ গন্ধ।

পুলটার একেবারে শেষপ্রান্তে একটা স্পিড বোটে চাপল ওরা। চালকটি ঘুমোচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসে সেলাম দিয়ে বলল, "সার, আমার নাম আলি।"

লোকটির চেহারাটি ছোট্টখাট্টো হলেও বেশ একটা চটপটে ভাব আছে। মুখখানা হাসি মাখা। তাকে পছন্দ হয়ে গেল কাকাবাবুর। চালক পছন্দ না হলে কোনও গাড়িতে চেপেই সুখ নেই।

ভট-ভট শব্দ করে স্পিড বোটটা চলতে শুরু করল। প্রথম থেকেই বেশ জোরে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে ছুটছে, মাঝে-মাঝে বড় ঢেউ এলে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে।

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, আগে কখনও স্পিড বোটে চেপেছিস?"

সন্তু প্রথমে বলল, "না।" তারপর বলল, "ও হ্যাঁ, একবার সুন্দরবনে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো নদীতে। সেখানে এরকম বড়-বড় ঢেউ তো নেই। আমি কখনও সমুদ্রে স্পিড বোটে ঘুরিনি।"

সন্তু বলল, "সিনেমায় দেখেছি।"

কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বোট কি কখনও উলটে যেতে পারে?"

কামাল বলল, "সহজে ওলটায় না।"

"কখনও কঠিন অবস্থায় পড়লে উলটে যায়?"

"তা যায়। ঝড়-বাদলের সময় বেশি ভয় থাকে।"

"উলটে গেলে কী হয়? যাত্রীরা প্রাণে বাঁচে?"

"দেখুন, খানিকটা তো রিস্‌ক থাকেই। তবে, এই বোট উলটে

গেলেও ডুবে যায় না। আবার সোজা করে নেওয়া যায়। ততক্ষণ সাঁতার কেটে থাকতে হয়।"

"যদি কেউ সাঁতার না জানে?"

"তা হলে তো খুব বিপদ। আমাদের এদিকে সব লোকই সাঁতার জানে। আপনি জানেন না?"

"সাঁতার তো জানি। কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার কাটা কি সহজ কথা? খোঁড়া পায়ে কতক্ষণই বা পারব?"

"তা হলে কি ফিরে যাব? পরে প্যাসেঞ্জার লঞ্চে আসা যেতে পারে। সেগুলো অনেক বড়, খুব ঝড়-বাদল না হলে ভয় থাকে না।"

"না, না, ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বেশ ভালই লাগছে। কী রে, সন্তু, ভয় পাচ্ছিস না তো?"

সন্তু জোরে-জোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল। জেটি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে আসার পর বোটটা এমনিতে ঠিকভাবেই চলছে, হঠাৎ-হঠাৎ কোথা থেকে ঢেউ আসছে, অমনই লাফিয়ে ওঠে, তখন বুকটা কেঁপে ওঠে ঠিকই। সন্তু দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে পাটাতন।

কাকাবাবু বোটের চালককে বললেন, "আলিভাই, সাবধানে চালাবেন। আপনার ওপর আমাদের জীবন নির্ভর করছে।"

আলি কাকাবাবুর ক্রাচদুটো একবার দেখে নিয়ে বলল, "আপনার মতন কোনও প্যাসেঞ্জার এই বোটে ওঠে নাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো অনেকদিন চালাচ্ছেন। এর মধ্যে একবারও বোট উলটেছে?"

আলি বলল, "তা ধরেন পাঁচ-ছয়বার তো হবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঁচ-ছ'বার? সবাই ঠিকঠাক ছিল, নাকি কেউ-কেউ..."

আলি বলল, "এই তো গত মাসেই, লস্কর সাহেবের পোলাড়া, কী যে হইল, আর পাওয়াই গেল না।"

কামাল বলল, "পোলাডা মানে বুঝলেন ? ছেলেটা।"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওসব কথা থাক। আচ্ছা কামাল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে তো বেশ কয়েকটা দ্বীপ আছে, তাই না ? যদি কেউ বলে, একটা দ্বীপে কেউ একটা মস্ত বড় চারতলা সাদা বাড়ি বানিয়ে রেখেছে, তা হলে সে-কথাটা

গাঁজাখুরি মনে হবে, তাই না ?"

কামাল বলল, "মোটেই না। এরকম বাড়ি তো আছে। একটা না, অনেক।"

কাকাবাবুই এবার অবাক হয়ে বললেন, "সে কী ? দ্বীপগুলোতে তো গরিব লোকেরা থাকে। তাদের ছোট-ছোট মাটি-খড়ের বাড়ি, বড়জোর টালির বাড়ি। সেখানে হঠাৎ মস্ত বড় তিন-চারতলা পাকা বাড়ি কে বানাবে ? আমি আগেরবার এসে তো এরকম কিছু

শুনিনি !"

কামাল বলল, "গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামেই বহু জায়গায় এরকম বাড়ি ছড়িয়ে আছে। এগুলোকে বলে সাইক্লোন শেলটার। প্রায় প্রত্যেক বছরই এদিকে সাঙ্ঘাতিক সাইক্লোন হয়, বহু লোক মারা যায়—"

সন্তু খুব আগ্রহ নিয়ে এই কথাবার্তা শুনছিল, এবার সে বলে উঠল, "খুব ঝড় হলেই খবরের কাগজে কক্সবাজারের নাম দেখি। এখানেই বেশি ঝড় হয় কেন ?"

কামাল বলল, "এটাকে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বলতে পারো। বঙ্গোপসাগরের এক জায়গায় ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তারপর সেটা এইদিকে ধেয়ে আসে। পশ্চিমবাংলার পাশ দিয়েই আসে, কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে এই ঝড়ের ঝাপটা লাগে না। আপনাদের ডায়মন্ড হারবার কিংবা কলকাতা প্রত্যেকবার বেঁচে যায়, ঝড়ের যত তেজ সব এসে আছড়ে পড়ে চিটাগাং-কক্সবাজারে। এখানে কত বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়, কত বাড়ির চাল, গাছপালা উড়ে যায় আকাশে, হাজার-হাজার গোরু-ছাগল মারা পড়ে। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়।"

সন্তু বলল, "একবার আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশেও এরকম সাইক্লোনের ধাক্কা লেগেছিল।"

কামাল বলল, "ঠিক। সেবারেও খুব জোর ঝড় হয়েছিল, এদিকে না এসে ওদিকে বেঁকে গিয়েছিল। তোমাদের ওড়িশাতেও কোনও-কোনওবার হয়। খালি পশ্চিমবাংলারই ভাগ্য ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশিবার এদিকেই আসে, প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। কয়েক বছর আগেই তো কক্সবাজারের এদিকে লাখখানেক লোক মারা গিয়েছিল না ?"

কামাল বলল, "তার বেশি। এদিকের মানুষের দুর্ভোগের শেষ

নেই। সেইজন্যই মাঝে-মাঝে ওইরকম পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝড়ে যখন গরিব মানুষের বাড়িঘর উড়ে যায়, তখন মানুষ ছুটে গিয়ে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তবু প্রাণে বাঁচে।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝলাম। বাড়িগুলো কে বানিয়ে দিয়েছে ?"

কামাল বলল, "আমাদের সরকার। মানে সবগুলো নয়। বাংলাদেশ সরকারের অত টাকা নেই। অন্য অনেক দেশও বানিয়ে দিয়েছে, জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আপনাদের ইন্ডিয়াও বানিয়ে দিয়েছে, আরও অনেক দেশ সাহায্য করেছে। চলুন না, আপনাকে সেরকম দু'-একটা বাড়ি দেখিয়ে দেব।"

আলি বলল, "ওই তো, ডাইন দিকে দ্যাখেন। ওই তো একখান ছাইকোন ছেল্টার !"

কাকাবাবু ও সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। স্পিড বোটটার একপাশে তীর দেখা যায়, আর-একপাশে অথৈ জল। তীরের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটি চৌকো সাদা রঙের বাড়ি দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ওখানে আর কিছু ছোট-ছোট মাটির বাড়ি রয়েছে, সেগুলো গ্রামের লোকদের, ওই বাড়িটা একেবারে অন্যরকম। অনেক উঁচু তো বটেই, একেবারে চৌকো এবং ধপধপে সাদা। দেখলেই বোঝা যায় নতুন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সব বাড়িই সাদা ?"

কামাল বলল, "বিদেশিরা যে-সব বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, সেগুলি একই রকম দেখতে। সামনে গেলে আরও দেখতে পাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এর পর আর-একটা প্রশ্ন আছে। গ্রামের মানুষদের জন্যই তো এই বাড়িগুলো বানানো হয়েছে। এমনও

দ্বীপ আছে, যে-দ্বীপে কোনও মানুষ নেই। সেই দ্বীপেও কি এরকম বাড়ি থাকতে পারে ?”

কামাল বলল, “হ্যাঁ পারে।”

আলি বলল, “একখান আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “মানুষের জন্যই তো সাইক্লোন শেল্টার। যে-দ্বীপে মানুষ নেই, সে-দ্বীপে শুধু-শুধু অত বড় বাড়ি বানিয়ে রাখবে কেন ?”

কামাল বলল, “জেলেদের জন্য। জেলেরা নৌকো নিয়ে অনেক দূরে-দূরে মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ ঝড় উঠলে তারা কী করবে ? আগে কত নৌকো ডুবে গেছে, কত জেলে মারা পড়েছে। এখন তারা ঝড়ের আভাস পেলেই কাছাকাছি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফাঁকা থাকলেও বাঁচবে না, তাই তাদের জন্যও বাড়ি রয়েছে।”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

আলি বলল, “সেই দ্বীপটা আমি দূর থেকে দেখছি একবার! দ্বীপটা ভাল না। সেখানে ভূত আছে।”

কাকাবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, “তাই নাকি, ভূত আছে ?”

আলি বলল, “এইজ্ঞে সার। যে মানুষগুলা আগে মরে গেছে, তারা বাড়িটায় ভূত হয়ে আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “তবে তো সেখানে যেতেই হয়। আমি কখনও ভূত দেখিনি।”

আলি বলল, “কিন্তু সে তো উলটা দিকে। দূর আছে।”

কামাল বলল, “আপনি যে মহেশখালি যাবেন বলেছিলেন। ওই যে দেখুন পাহাড়ের ওপর মন্দির দেখা যাচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “মন্দির তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ওখানেই থাকবে। আগে চলো, ভূত দেখে আসি। সেটা একটা নতুন

অভিজ্ঞতা হবে। কামাল, তোমার কি ভূতের ভয় আছে নাকি ?”

কামাল হা-হা করে হেসে বলল, “কী যে বলেন! ভূত-ফুত কিছু আছে নাকি ? যেসব গ্রামে এখনও ইলেকট্রিসিটি পৌঁছয়নি, শুধু সেই-সব জায়গায় মানুষ এখনও ভূতে বিশ্বাস করে।”

কাকাবাবু আলিকে জিজ্ঞেস করলেন, “সেই দ্বীপে যে ভূত আছে তা তুমি কী করে জানলে ? অন্যরা বলেছে, না নিজের চোখে দেখেছ ?”

আলি বলল, “নিজে দেখিছি।”

কাকাবাবু বললেন, “বটে, বটে! কী দেখেছ বলো তো ?”

আলি বলল, “সে-দ্বীপে মানুষজন নাই। তবু রাত্তিরবেলা দপ-দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আলেয়া না, চড়া আগুন। আর মাঝে-মাঝে একটা শব্দ হয়, কী বিকট সেই শব্দ, যেন মনে হয়, একখান দৈত্য পেটের ব্যথায় চিখরাচ্ছে!”

এবার সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, “দৈত্যদের পেটব্যথা হলে কীরকম চিৎকার করে তাও কখনও শুনিনি। তা হলে তুমি বলছ, শুধু ভূত নয়, দৈত্যও আছে সেখানে ? নাও, সবাই কলা খাও, কলা খেয়ে গায়ের জোর করে নাও!”

সেই দ্বীপটার কাছে পৌঁছতে আরও ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। এখন গনগনে দুপুর। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে সূর্য। এখন একটুও শীত নেই, কাকাবাবু কোট খুলে ফেলেছেন, সন্তুও খুলে ফেলেছে সোয়েটার। এরকম দিনের আলোয় কি ভূত দেখা যায় ? আলিও বলল যে, আগুন-টাগুন দেখা যায় সন্ধের পর। তা হলে এত তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে কী হবে ?

কামাল বলল, “তা হলে এক কাজ করা যাক। কাছাকাছি চাঁদপাড়া নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সাগরের নোনা

জল ঢুকে যায় বলে এখন বাঁধ বাঁধার কাজ চলছে। সরকারি লোকেরা ক্যাম্প করে আছে সেখানে। একজন এঞ্জিনিয়ার আমার খুব চেনা। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই আমরা। তারপর বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লেই হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো সেখানেই যাই। কিন্তু আমরা কোন দ্বীপে যাব, সেসব কিছু তাদের বলবার দরকার নেই। বলবে, আমরা এমনই বেড়াচ্ছি। বাঁধের কাজ দেখতে এসেছি।"

কামাল বলল, "আলি, চলো চাঁদপাড়ায়।"

চাঁদপাড়ায় প্রায় তিনশো লোক মাটি কেটে বাঁধ দিচ্ছে। আগের বছর সাইক্লোনের সময় সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে উঠে পুরো গ্রামটা ভাসিয়ে দিয়েছিল। একটাও ঘরবাড়ি আস্ত নেই। তবে যেখানে-যেখানে সমুদ্রের জল জমে ছিল, এখন সেখানে সেই জল শুকিয়ে নুন বানানো হচ্ছে। গভর্নমেন্ট বাঁধ বানিয়ে দিচ্ছে, মজদুররা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মাছ ধরছে অল্প জলে। একজনের ঝুড়িতে লাফাচ্ছে বড়-বড় চিংড়ি।

কামালের চেনা লোকটি জোর করে ওদের ভাত-মাছের ঝোল খাইয়ে দিল। গরম-গরম ভাত আর টাটকা চিংড়িমাছের ঝোল, অপূর্ব স্বাদ।

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখো, ভেবেছিলাম শুধু কলা খেয়ে দিনটা কাটাতে হবে। কেমন সুখাদ্য জুটে গেল। কোনও হোটেলে এত টাটকা চিংড়িমাছ পাবে ?"

কামাল বলল, "এতদূর পর্যন্ত তো আসবার কথা ছিল না। আমিও আগে ভাবিনি।"

মাটি-কাটা শ্রমিকরা কাকাবাবুকে ভেবেছে কোনও অফিসার। খোঁড়া পা নিয়ে এত দূরে এসেছেন বাঁধের কাজ দেখার জন্য, তা

হলে নিশ্চয়ই খুব বড় অফিসার হবেন। সবাই বেশি-বেশি কাজ করতে লাগল।

বিকেলের একটু আগে বেরিয়ে পড়া হল সেখান থেকে। খানিক বাদেই সন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখল, এখন চারদিকেই সমুদ্র, কোনওদিকেই আর তীর দেখা যায় না। শীতকালের আকাশে মেঘ নেই। আকাশ নীল, জলও নীল। এখানে আবার ঢেউ বেশি, ছলাত-ছলাত শব্দ হচ্ছে আর স্পিড বোটটা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে।

কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দূরেও জেলেরা মাছ ধরতে আসে ?"

কামাল বলল, "জি, আসে। এখন তো শীতকাল, এই সময় মাছ ওঠে কম। গরমকালে এলে দেখবেন, নৌকোয়-নৌকোয় জায়গাটা ভরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "গরমকালেই ঝড় ওঠে। শীতকালে তো তেমন ঝড় হয় না। শীতের সময় এই সাদা বাড়িগুলো খালি পড়ে থাকে ?"

কামাল বলল, "অন্য সময় কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। না হলে তো বাড়িগুলো জবরদখল হয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "দূরে-দূরে দু'-একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখনকার নৌকোয় তো বৈঠা বাইতে হয় না। মোটর লাগানো থাকে, তাই অনেকদূর যেতে পারে। নৌকো কথাটাই উঠে যাচ্ছে, এখন বলে ভটভটি।"

কামাল বলল, "আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য এই জেলেরাও পাচ্ছে। এত দূর বৈঠা বেয়ে আসতে হলে কত পরিশ্রম হত ভাবুন ! সময়ও লাগত অনেক।"

কাকাবাবু বললেন, "ছোটবেলায় দেখেছি, পালতোলা নৌকো,

বাতাসে টেনে নিয়ে যেত, একজন মাঝি হাল ধরে বসে থাকত, ভারী সুন্দর দেখাত।"

এইরকম কথা বলতে-বলতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপর এক সময় সেই কূলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকে জেগে উঠল একটা দ্বীপ। প্রায় গোল আকৃতি, মাঝারি উচ্চতার গাছপালার রেখা দিয়ে ঘেরা, আর-একটাও বাড়িঘর নেই, শুধু সাদা রঙের বিশাল এক চৌকো বাড়ি মাথা উঁচু করে আছে। সমুদ্রের নীল, গাছপালার সবুজ আর বাড়িটির সাদা রং মানিয়েছে চমৎকার!

সন্তু অস্ফুটভাবে বলল, "তা হলে সত্যিই এরকম দ্বীপ আছে। তাতে সাদা বাড়িও রয়েছে। কী করে বলতে পারল মেয়েটা?"

কাকাবাবু বললেন, "তোরা তো বিশ্বাস করিসনি। কেউ-কেউ পারে। এখন আলির কথার বাকিটা মিললেই হয়।"

কামাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের কলকাতার একটি মেয়ে, সে কখনও এদিকে আসেনি, অথচ সে বলে দিয়েছিল, এরকম দ্বীপের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি আছে।"

কামাল বলল, "হয়তো কোনও পত্রিকায় পড়েছে। বাংলাদেশের সাইক্লোন নিয়ে অনেক বিদেশি কাগজেই লেখালেখি হয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এমন সুন্দর একটা দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না কেন?"

কামাল বলল, "খাবার পানি পাবে কোথায়? চারদিকে সমুদ্র, তার পানি এত লোনা যে, মুখে দেওয়া যায় না। সেই যে ইংরেজি কবিতা আছে না, ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার, নট এ ড্রপ টু ড্রিংক!"

আলি বলল, "এই পর্যন্ত! এইখান থিকা দ্যাখেন।"

কাকাবাবু মুগ্ধভাবে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এমন সুন্দর একটা দ্বীপ, ঠিক যেন স্বর্গের বাগান, এটা ভূতেরা দখল করে থাকবে, সেটা তো ঠিক নয়! জেলেদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেটা ভূতেরা নিয়ে নেবে? এ ভারী অন্যায়। এখান থেকে ভূত তাড়াবার কেউ চেষ্টা করেনি?"

কামাল বলল, "আসল ব্যাপার কী জানেন, সাইক্লোন বা জোর ঝড়বাদল হলেই এইদিকটা সম্পর্কে সরকারের টনক নড়ে। অন্য সময় এদিকে তো কেউ আসে না। এই ভূতের ব্যাপারটা তো আমি প্রথম শুনছি!"

স্পিড বোটটা থেমে যেতে দেখে কাকাবাবু বললেন, "এ কী আলিভাই, এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন?"

আলি বলল, "আমি আর যাব না!"

দ্বীপটার দিকে তাকালে যে সেখানে ভয়ের কিছু আছে, তা কল্পনাও করা যায় না। সূর্য সবেমাত্র ডুবে গেলেও এখনও লালচে রঙের আলো ছড়িয়ে আছে, দূরের সাদা বাড়িটাও যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। কয়েকটি সিগাল পাখি দুলছে তীরের কাছে। এই অপরূপ ছবিটি শুধু দূর থেকে দেখে আশা মেটে না।

কিন্তু আলি আর কাছে যেতে রাজি নয়। সে এখন ফিরতে চায়। এতক্ষণ সে বেশ হাসিখুশি মানুষ ছিল, এখন কীসের যেন আশঙ্কায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

কামাল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, "মিঞা, তুমি এত

ভয় পাচ্ছ কেন ? এই দ্যাখো, আমার কাছে পিস্তল আছে। ভূত-টুত যে-ই আসুক, একেবারে ফুঁড়ে দেব !”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা ভুতুড়ে আগুন দেখলাম না, দৈত্যের চিৎকার শুনলাম না, এর মধ্যেই ফিরে যাব ?”

আলি বলল যে, “সেসব রোজ-রোজ না-ও হতে পারে। এক-একদিন হয়। যদি মাঝরাত্তিরে হয়, ততক্ষণ কী বসে থাকব ?”

কাকাবাবু এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, “ঠিক আছে, তুমি ফিরে যেতে চাও, ফিরে যাবে। আমাদের ওই দ্বীপে নামিয়ে দাও। কাল সকালে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।”

আলি এবারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল, “আপনেরা ওইখানে সারারাত থাকবেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “আমার আর সন্তুর এরকম অভ্যেস আছে। কামালও ফিরে যাক।”

কামাল জোর দিয়ে বলল, “মোটেই না। আমিও থাকব। ওই বাড়িটা কেউ দখল করেছে কি না সেটা আমারও জানা দরকার। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করব।”

আলি তবু বিড়বিড় করে বলল, “অপ্‌য়া জায়গা। সতু শেখের ভটভটি এর ধারেকাছে এসে ডুবে গিয়েছিল, আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি !”

আবার সে স্টার্ট দিল। ক্রমশই দ্বীপটা কাছে আসছে, সেখানে জনপ্রাণীর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। গাছগুলো বড় হয়ে উঠছে ক্রমশ। এক জায়গায় এসে মোটর বোটটা থামল, সেখানে কাদা নেই, বেশ পরিষ্কার বালি। দুটো কচ্ছপ সেখান থেকে সরসর করে জলে নেমে গেল।

সন্তুই প্রথম নেমে গেল এক লাফ দিয়ে। কামাল নেমে

কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “ধরব ?”

কাকাবাবু বললেন, “না। অন্যের সাহায্য ছাড়াই তো জীবনটা কাটাতে হবে।”

তাঁর ক্রাচ নরম বালিতে গেঁথে গেলেও আস্তে-আস্তে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, “ঠিক আছে আলি, তুমি যাও, কাল সকালে এসো !”

কামাল বলল, “তুমি চাঁদপাড়ায় গিয়ে থাকতে পারো।”

আলি তবু ফেরার উদ্যোগ করল না। একটুক্ষণ মুখখানা গোঁজ করে থেকে সে নোঙর ফেলল। তারপর বোট থেকে নেমে এসে বলল, “আপনাদের ফেলে চলে যাব, আমারও তো একটা ধর্ম আছে !”

তারপর সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, “ওইটুকু পোলাডা যদি ভয় না পায়, আমি বুড়া মানুষটা ভয়ে পালাব ?”

কামাল তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, “বাঃ, এই তো চাই। বাংলাদেশের মানুষ অত সহজে ভয় পায় না।”

চারজনে একসঙ্গে এগোল। এর মধ্যে আকাশের রং মিলিয়ে গেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার। দূরের সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কামাল বলল, “মনে হয়, মাঝে-মাঝে দু-চারজন জেলে রাত্তিরে থেকে যায়। আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করে। সেই আগুন দূর থেকে দেখে লোকে ভয় পায়।”

আলি বলল, “তেমন আগুন না। হা-হা আগুন।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখনও এ-দ্বীপে লোক আছে। তারা আড়াল থেকে আমাদের দেখছে !”

পকেট থেকে টর্চ বার করে কাকাবাবু চারদিকে আলো ঘুরিয়ে

দেখলেন। গাছপালা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

কামাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কে আছ ? কেউ আছ এখানে ?"

অমনই খানিক দূরে কয়েকটা গাছের আড়ালে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। যেন মস্ত বড় একটা মশাল মাটিতে পোঁতা, লকলক করল তার শিখা।

এরকম দেখলে বুকটা ধক করে উঠবেই। আলি কাকাবাবুর গায়ের কোট চেপে ধরল।

সেই আগুন থেকে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে, তাতে পাওয়া যাচ্ছে ধূপের মতন একটা মৃদু গন্ধ।

কামাল রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরে বলল, "কে ওখানে আগুন জ্বালল ? মনে হচ্ছে একটা মাটির হাঁড়ি থেকে বেরোচ্ছে। কিছু একটা বাজি নাকি ?"

কামাল এগিয়ে গেল সেটা দেখতে। কাকাবাবু বললেন, "বেশি কাছে যেয়ো না, ওটা ফেটে যেতে পারে।"

ফাটল না, আগুনটা কমে গিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, গন্ধটাও তীব্র হল।

এবার পেছনদিকেও আর এক-জায়গায় জ্বলে উঠল ওইরকম আগুন !

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "গ্যাস ! কামাল, সাবধান ! কিছু একটা গ্যাস বেরোচ্ছে।"

কামাল ততক্ষণে মাতালের মতন টলতে শুরু করেছে, হাত থেকে খসে গেছে রিভলবার, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

আলি দারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "হায় আল্লা !"

তারপর সে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "হুজুর বাঁচান আমারে। দমবন্ধ হয়ে আসছে !"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "ছাড়ো, ছাড়ো ! এখান থেকে

সরে যেতে হবে।"

আলি আরও জোরে আঁকড়ে ধরল কাকাবাবুকে। তিনি এবার জোরে ধাক্কা দিয়ে আলিকে ফেলে দিলেন মাটিতে। তা করতে গিয়ে একটা ক্রাচ খসে পড়ল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আর সময় পেলেন না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি কোনওক্রমে বললেন, "সন্তু, পালিয়ে যা, এখান থেকে অনেক দূরে সরে যা !"

সন্তুরও চোখ জ্বালা করতে শুরু করেছিল, সেই অবস্থাতেও সে বাঁই বাঁই করে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আলি, কামাল আর কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন সেখানে।

একটু পরেই দ্বিতীয় আগুনটাও নিভে গেল, বাতাসে মিলিয়ে গেল ধোঁয়া। তারপর গাছপালার আড়াল থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এসে ওদের তিনজনকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল সাদা বাড়িটার দিকে। কাকাবাবুর ক্রাচদুটো পড়ে রইল সেখানে।

সাদা বাড়িটার নীচের তলায় কোনও ঘর নেই। বড়-বড় ফ্ল্যাট বাড়ির নীচের তলায় যেমন শুধু পিলার থাকে আর গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকে, সেইরকম। এবারে সেখানে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালা হল, তাতে দেখা গেল ঠিক মাঝখানে সিংহাসনের মতন লাল মখমলে ঢাকা একটা উঁচু চেয়ার রয়েছে। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে চটি ফটফটিয়ে নেমে এল একজন মধ্যবয়স্ক লোক, ফরসা রং, চেহারাটা বেশি বড় নয়, রোগা-পাতলাই বলা যায়, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সে আলখাল্লার মতন একটা পোশাক পরে আছে, সেটা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাতে নানা রঙের জরির লম্বা-লম্বা স্ট্রাইপ, যখন যেদিকে আলো পড়ে, অমনই ঝকমক করে ওঠে।

লোকটিকে বাঙালি বলে মনে হয় না, তবে ঠিক কোন জাতের, তাও বোঝা যায় না, কোরিয়ান, চিনে বা জাপানি কিছু একটা হতেও পারে। তার হাতে এক-দেড় হাত লম্বা একটা ছোট লাঠির মতন, সেটা মনে হয় সোনার তৈরি। সে এসে সিংহাসনটার কাছে দাঁড়াতেই একসঙ্গে অনেক গলা শোনা গেল, "মাস্টার! মাস্টার!"

তখন বোঝা গেল, পেছনদিকের অন্ধকারে অনেক লোক চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ। এবার তারা উঠে এল। প্রথমে পরপর দুজন মুখোশপরা লোক তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেল। তারপর এল লাইন দিয়ে একদল ছেলে, তাদের প্রত্যেকের বয়েস ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে, সকলের উচ্চতা সমান। তারা প্রথমে সেই লোকটিকে ঘিরে সাতবার গোল হয়ে ঘুরল। তারপর একজন-একজন করে তার সামনে বসল হাঁটু গেড়ে। সেই লোকটি তাদের কাঁধে সেই সোনার দণ্ডটা ছুঁইয়ে বলতে লাগল, "আই ব্লেস ইউ! তোমাদের ট্রেনিং প্রায় ফিনিশ্‌ড। তোমরা হবে আমার হিউম্যান রোবট! আমি যা আদেশ করব ইউ উইল ওবে!"

লোকটি কথা বলে ইংরিজি-বাংলা মিশিয়ে। বাংলা শব্দগুলোর উচ্চারণ অন্যরকম। সাহেবের নতুন শেখা বাংলার মতন। লোকটির কথা বলা শেষ হতেই ছেলেগুলি প্রত্যেকে যন্ত্রপুতুলের মতন বলতে লাগল, "ইয়েস মাস্টার! ইয়েস মাস্টার!"

সন্তু বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল অনেকটা। সাদা বাড়িটার তলায় আলো জ্বলতে দেখে সে গুটি-গুটি এগিয়ে এসেছে সেদিকে। অন্ধকারে একটা গাছের আড়াল থেকে সব দেখছে।

যে-ছেলেগুলো রঙিন আলখাল্লা পরা লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসছে, তাদের মধ্যে জোজোও আছে! জোজোকে দেখেই সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, আর-একটু হলে জোজো বলে ডেকে উঠত। নিজেই মুখচাপা দিয়েছে। কিন্তু 'জোজো'

ওরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছে কেন? চোখের মণিদুটো একেবারে স্থির, যেন পলকও পড়ছে না। হাঁটছে দম-দেওয়া পুতুলের মতন!

সন্তু গুনে দেখল, জোজোর বয়েসী, অর্থাৎ তারও বয়েসী, মোট একুশটা ছেলে আছে ওখানে। সকলেরই ভাবভঙ্গি একই রকম। হাঁটাচলা আর চোখ অস্বাভাবিক। ওই আলখাল্লা পরা লোকটা বলল, ওদের হিউম্যান রোবট বানাবে। যন্ত্র দিয়ে বানানো রোবট অনেক সময় মানুষের মতন কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু জীবন্ত মানুষ কি রোবট হতে পারে? ওই লোকটা এই ছেলেদের হিপনোটাইজ্‌ড করে রেখেছে। সেই অবস্থায় নাকি মানুষকে দিয়ে ইচ্ছেমতন কাজ করানো যায়। ওই লোকটা জোজোদের দিয়ে কী কাজ করাবে।

জোজো আর সবক'টা ছেলেই ওই লোকটাকে বলছে, মাস্টার। তার মানে, ওই লোকটা প্রভু, আর সবাই ভৃত্য? ছি ছি ছি ছি। জোজো কী করে বলছে, ওর লজ্জা করে না? এটা জোজোর চরিত্রের সঙ্গে মেলে না মোটেই। কিংবা জোজো ইচ্ছে করে ওরকম সেজে আছে?

সবক'টা ছেলেকে 'আই ব্লেস ইউ' বলে সোনার দণ্ডটা ছোঁয়াবার পর আলখাল্লা পরা লোকটা মাটিতে পড়ে থাকা কাকাবাবুদের দিকে তাকাল। একজন মুখোশধারীকে ডেকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

সেই মুখোশধারীটি খুব সম্ভবত বুঝিয়ে দিল ওরা কীভাবে এসেছে, কীভাবে ধরা পড়েছে। লোকটি ঠোঁট বেঁকিয়ে অবহেলার সঙ্গে শুনল। তারপর বলল, "একটা ছেলে ভেগেছে? ফাইন্ড হিম! গেট হিম! ওকে ধরো। এই আইল্যান্ড থেকে সে পালাবে কোথায়? ঠিক আসতে হবে আমার কাছে!"

তারপর কামাল আর আলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "উহাদের বেঁধে রাখো। পরে ব্যবস্থা হবে। অন্য লোকটার জ্ঞান ফেরাও।"

দু'জন লোক কাকাবাবুর মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। একটু পরেই কাকাবাবু চোখ মেলে তাকালেন। লোক দুটো কাকাবাবুর দু' হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

আলখাল্লা-পরা লোকটি কাকাবাবুর দিকে একটা আঙুল নেড়ে বলল, "কাম হিয়ার। আমার নিকটে এসো।"

কাকাবাবু লোকটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন। এখনও তাঁর মাথা একটু-একটু ঘুরছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়নি। তিনি বললেন, "আমার ক্রাচদুটো কোথায়? আমি খোঁড়া লোক, হাঁটতে পারি না।"

এমনই সময় একটা লোক একটা লাঠি দিয়ে সজোরে কাকাবাবুর মাথায় মেরে বলল, "সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারো, হাঁটতে পারো না? মাস্টার ডাকছেন, যাও!"

বেশ জোরে লেগেছে, ঘাড়ের কাছটায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে খুব শান্ত গলায় বললেন, "আমাকে মারলে কেন? তোমাকে কেউ অমনভাবে মারলে কেমন লাগবে? আমি সত্যি খোঁড়া, আমার ক্রাচদুটো দাও!"

আলখাল্লা-পরা লোকটি হুকুমের সুরে বলল, "ডোন্ট আর্গু, ইধারে এসো!"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কী হচ্ছে? যাত্রাপালা?"

একজন লোক কাকাবাবুর হাত ধরে টানতেই কাকাবাবু প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লোকটি লাঠি দিয়ে আবার খুব জোরে মারল কাকাবাবুর মাথায়। কাকাবাবু সেটা সামলাতে পারলেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

আলখাল্লা-পরা লোকটি ফিক করে মাটিতে থুতু ফেলল। তারপর বলল, "ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। উহাকে ফেলে দাও! একটা স্পিড বোটে চাপিয়ে অনেকখানি সমুদ্রে নিয়ে যাও। থ্রো হিম! শার্ক ওকে খাবে! ক্রোকোডাইল ওকে খাবে। উহার কোনও চিহ্ন থাকবে না।"

দু'জন লোক মাটি থেকে তুলে নিল কাকাবাবুকে।

সন্তু সব দেখছে, এবার আর সামলাতে পারল না। তীরের মতন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকদুটোর ওপর। লাথি মেরে ফেলে দিল একজনকে। তারপর সে কাকাবাবুকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, যদি তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তার ধারণা, জ্ঞান ফিরে পেলে কাকাবাবু উদ্ধার পাওয়ার ঠিকই উপায় বার করে ফেলবেন।

কিন্তু কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরল না। দু'জন মুখোশধারী সন্তুকে মাটিতে চেপে ধরে একজন তার পিঠের ওপর পা রাখল।

হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠল সেই আলখাল্লা-পরা লোকটি। অমনই বাকি সকলেই একই রকম ভাবে হা-হা করে হাসতে লাগল।

তারপর আলখাল্লাধারী যখন বাঁ হাত তুলে বলল, "চুপ!" অমনই সঙ্গে-সঙ্গে সবাই থেমে গেল।

আলখাল্লাধারী এবার দু'জনকে ইঙ্গিত করল কাকাবাবুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

তারা কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে এল জলের ধারে। তারপর যে স্পিড বোটে কাকাবাবুরা এসেছিলেন, সেটাতেই তোলা হল তাঁকে। সেটা চালিয়ে অনেকটা দূর এসে থামল। এখানে সমুদ্রের কোনও দিক দেখা যায় না, শুধুই সমুদ্র, লোক দুটো কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে কয়েকবার দুলিয়ে ছুড়ে ফেলে

দিল জলে। অন্ধকারে ঝপাং করে শব্দ হল।

স্পিড বোটটা আবার ফিরে গেল ফট-ফট শব্দ করে। একটু বাদেই মিলিয়ে গেল শব্দটা।

কাকাবাবু ডুবতে লাগলেন। ডুবতে-ডুবতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। যারা সাঁতার জানে, জ্ঞান থাকলে তারা কক্ষনও ডোবে না। কাকাবাবু ভেসে উঠলেন।

প্রথমে তিনি মনে করতে পারলেন না, ঠিক কী হয়েছে। জলের মধ্যে পড়লেন কী করে? এটা কি স্বপ্ন দেখছেন নাকি? না, স্বপ্ন কী করে হবে, এই তো ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের নোনা জল লেগে জ্বালা করছে মাথার ক্ষতস্থানটা।

আস্তে-আস্তে তাঁর মনে পড়ল, একটা লোক তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে মেরেছে দু'বার। লোকটাকে দেখতে কেমন ছিল? মুখোশ পরা ছিল, মুখ দেখা যায়নি। মুখোশ পরা থাক আর যাই-ই থাক, লোকটাকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে না? তাঁর গায়ে কেউ হাত তুললে তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। লোকটার মাথায় ঠিক ওইভাবে মারতে হবে দু'বার!

এই অবস্থাতেও কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল। আগে তো বাঁচতে হবে, তারপর প্রতিশোধের চিন্তা। এই অবস্থায় বাঁচবেন কী করে? কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারবেন? একটা পায়ে জোর নেই, অন্য পা-টা কিছুক্ষণ পরেই অসাড় হয়ে যাবে। প্যান্ট-কোট-জুতো-মোজা পরে কি সাঁতার কাটা যায়? শরীরটা ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ।

ক্রাচ দুটো কোথায় গেল? আঃ, এই এক জ্বালা! কোথাও একটু মারামারি হলেই ক্রাচ দুটো হারিয়ে যায়। কতবার যে ক্রাচ তৈরি করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। এখন তিনি ক্রাচ পাবেন কোথায়? ক্রাচ ছাড়া যে তিনি অচল।

আবার হাসি পেল। এখানে যদি ডুবেই মারা যান, তা হলে আর ক্রাচ দিয়ে কী হবে? প্রাণে বাঁচলে অনেক ক্রাচ পাওয়া যাবে!

এত বড় বিপদের সময়ও মানুষের কত তুচ্ছ কথা মনে পড়ে।

কাকাবাবু টের পেলেন যে, জলে স্রোত আছে। তিনি শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন। স্রোত তাঁকে একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার না ভাটার টান? যদি ভাটা হয়, তা হলে আরও সর্বনাশ, তিনি গভীর সমুদ্রে চলে যাবেন। জোয়ার হলে এগোতে পারবেন কক্সবাজারের দিকে।

জোয়ার না ভাটা, তা বোঝার উপায় নেই। চাঁদ নেই আকাশে, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

এই সমুদ্রে হাঙর থাকতে পারে। একরকমের ছোট-ছোট হাঙরকে বলে কামঠ। সেগুলো কচাত করে এক কামড়ে পা কেটে নিয়ে যায়। সেই কামঠের পাল্লায় পড়লেই হয়েছে আর কি! দুটো পা-ই যাবে। দুটো পা গেলে আর বেঁচে লাভ কী! রাজা রায়চৌধুরী এইভাবে মরবে? সন্তু ওই দ্বীপে রয়ে গেল। কী হবে সন্তুর?

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ পেয়ে কাকাবাবু চমকে গেলেন। দূরে দেখতে পেলেন একটা জ্বলজ্বলে আলো। প্রথমে ভাবলেন, সেই দ্বীপের কাছে ফিরে এসেছেন নাকি? এ সেই দৈত্যের চিৎকার? তারপরই বুঝতে পারলেন, এসব একেবারে আজেবাজে ভাবছেন। একটা লঞ্চ কিংবা স্টিমার আসছে, সেটা একবার ভোঁ দিল, সামনে সার্চলাইট জ্বলছে।

কাকাবাবুর বুকের মধ্যে আনন্দ উছলে উঠল। এই তো বাঁচার উপায় পাওয়া গেছে। লঞ্চের সারেং নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেয়ে তুলে নেবে। কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "হেল্‌প!

হেল্প ! বাঁচাও, বাঁচাও !"

সমুদ্রের ঢেউ আর লঞ্চের আওয়াজে সে-চিৎকার শোনা গেল না। আরও বিপদ হল। লঞ্চের জন্য বড়-বড় ঢেউ উঠতে লাগল, তাতে কাকাবাবু উঠছেন আর নামছেন, তাঁকে দেখা যাবে না। কাকাবাবুর গায়ে কালো কোট, আলো পড়লেও মনে হবে, কিছু একটা ময়লা।

হলও তাই, লঞ্চটা সার্চলাইট ঘোরাতে-ঘোরাতে খানিকটা দূর দিয়ে চলে গেল। কাকাবাবু যতটা আশার আনন্দ পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি নৈরাশ্যে ভরে গেল তাঁর বুক। আর কী বাঁচার কোনও উপায় আছে ? হাত দুটোয় ব্যথা হয়ে গেছে, পা অবশ। আর ভেসে থাকতে পারছেন না। এত ক্লান্ত লাগছে যে, ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়তে। সমুদ্রের একেবারে তলায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়াই তো ভাল। কাকাবাবুর চোখ বুজে এল।

আলখাল্লা-পরা লোকটি এবারে বলল, "ব্রিং দ্যাট বয়, ছেলেটিকে আমার নিকটে আনো ?"

কাকাবাবুকে ওইভাবে অজ্ঞান করে নিয়ে যেতে দেখে সন্তু দু'বার ফুঁপিয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। কাকাবাবু একদিন বলেছিলেন, সব মানুষকেই একদিন না একদিন মরতে হয়। মানুষ কতরকম ভাবে মরে। কিন্তু মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মসম্মান বজায় রেখে, মাথা উঁচু করে থাকতে হয়। মৃত্যুর কাছে হার মানতে নেই।

দুটি লোক সন্তুকে সেই আলখাল্লাধারীর সামনে দাঁড় করাতেই সন্তু চোখ বুজে ফেলল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "হোয়াটস ইয়োর নেম ? নাম কী আছে ?"

সন্তু বলল, "সুনন্দ রায়চৌধুরী।"

"অত বড় নাম দরকার নেই। নিক নেম বলো। ছোট নাম !"

"সন্তু।"

"গুড। সন্টু ? বেশ নাম আছে। তুমি চক্ষু ক্লোজ করে আছ কেন ?"

"আমার ইচ্ছে হয়েছে।"

"ওপ্‌ন ইয়োর আইস। মাই অর্ডার। চক্ষু খোলো !"

"আমি কারুর হুকুমে চোখ খুলি না, চোখ বন্ধ করি না।"

দু'পাশের লোক দুটি দু' দিক থেকে ধাঁই ধাঁই করে সন্তুর দু' গালে চড় কষাল। সন্তু একটা শব্দও করল না। চোখ বোজাই রইল।

আলখাল্লাধারী হাততালি দিয়ে উঠল।

একজন মুখোশধারী জিজ্ঞেস করল, "মাস্টার, একটা লোহা গরম করে আনব ? চোখের সামনে ধরলে বাপ-বাপ বলে চোখ খুলবে।"

মাস্টার বলল, "না। ব্রেভ বয় ! এরকম ছেলেই আমার চাই। ওর চোখ নষ্ট করা চলবে না। পরে ঠিক চোখ খুলবে, হি উইল ওবে মি, আমার সব কথা শুনবে। টেক হিম আপস্টেয়ার্স।"

লোক দুটো সন্তুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে চলল। দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে চারতলার একটা ঘরে ওকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখল। সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘর,

কোনও কিছু নেই। দেওয়ালের রং সাদা। দুটো বড়-বড় জানলা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। একটা জানলার ছিটকিনি খুলে কাঠের পাল্লাটা ঠেলতেই সেটা সম্পূর্ণ খুলে গেল, জানলায় কোনও লোহার শিক বা গ্রিল নেই!

ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের আশ্রয় নেওয়ার জন্য এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। এখানে কেউ সবসময় থাকে না, চোর-ডাকাতের কথাও চিন্তা করা হয়নি, তাই জানলায় গ্রিল বা শিক লাগায়নি। এরকম ঘরে সন্তুকে আটকে রেখে লাভ কী? সে তো জানলা দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে।

সন্তু মাথা বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল। চারতলা, এখান থেকে লাফালে হাড়গোড় টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। বাইরের দেওয়ালে পা রাখার কোনও জায়গা নেই। কাছাকাছি কোনও জলের পাইপও চোখে পড়ল না।

সন্তু আরও অনেকটা ঝুঁকে ওপরে ছাদের দিকটা দেখে নিল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে রইল লক্ষী ছেলে হয়ে।

ঘণ্টাখানেক বাদে দরজা খুলে একজন একটা প্লেটে তিনখানা পরোটা আর আলুর দম দিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল সন্তু। হাতের সামনে খাবার পেলে সে অবহেলা করে না। এর পর আবার কখন খাবার জুটবে কি জুটবে না, তার ঠিক নেই।

খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দিল না? পরোটা খেলেই জল তেষ্টা পায়। সন্তু ভাবল, একজন কেউ নিশ্চয়ই প্লেটটা ফেরত নিতে আসবে, তখন তার কাছে জল চাইবে। হয়তো দিতে ভুলে গেছে। কিন্তু কেউ আর এল না।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। মাঝে-মাঝে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিছু লোক চলে যাচ্ছে এ-ঘরের পাশ দিয়ে। এ-ঘরে

বিছানা নেই, একটা শতরঞ্চি বা মাদুর পর্যন্ত নেই, ওরা কি ভেবেছে, সন্তু মেঝেতে শুয়ে ঘুমোবে? দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল সন্তু।

একসময় সব শব্দ থেমে গেল। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সন্তু। তারপর উঠে একটা জানলার পাল্লা খুলে দেখল। তারপর সেই জানলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা বার করে দিল বাইরে। নীচের দিকে নামবার উপায় নেই। কিন্তু খানিকটা উঁচুতে ছাদের কার্নিস। হাত তুলে ছোঁয়া যায়। সেটা ধরে ঝুলতে-ঝুলতে ওপরে ওঠা যাবে কী করে? সে-চিন্তা না করে সন্তু দু' হাতে ছাদের কার্নিস ধরে ঝুলে পড়ল। হাত একটু আলগা হলেই সোজা নীচে পড়ে যাবে। শরীরটাকে দোলাতে-দোলাতে একবার উলটো সামার সল্ট দিয়ে সন্তু উঠে পড়ল কার্নিসের ওপর। তার শরীরটা কাঁপছে। একচুল এদিক-ওদিক হলে একেবারে আছড়ে পড়ত নীচে। আবার তার মুক্তির আনন্দও হচ্ছে।

ছাদটা বিরাট, ফুটবল খেলার মাঠের মতন। আকাশ অন্ধকার বলে সমুদ্রের কিছুই দেখা যায় না। খানিকটা দূরে সমুদ্রের ওপর একটা আলো জ্বলছে। অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওখানে একটা লঞ্চ বা স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কাদের? এদেরই নাকি? কাকাবাবুকে কি সত্যিই সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, না কোথাও আটকে রেখেছে? অজ্ঞান অবস্থায় সমুদ্রে ফেলে দিলে কাকাবাবু বাঁচবেন কী করে? কাকাবাবু প্রায়ই বলেন, 'আমার চার্মড লাইফ। মহাভারতের ভীষ্মের মতন আমার ইচ্ছামৃত্যু। অন্য কেউ আমাকে মারতে পারবে না।'

ছাদ থেকে নামার সিঁড়ির মুখে কোনও দরজা নেই। সন্তু পা টিপে-টিপে নেমে এল। চারতলায় লম্বা টানা বারান্দা, তার দু'

দিকে সারি-সারি ঘর। সন্তু যে-ঘরে ছিল, সেটা ছাড়া আর সব ঘরের দরজা খোলা। এখানকার সকলেই ওই মাস্টার নামের লোকটার কথায় ওঠে-বসে। কেউ পালাতে চায় না ?

সন্তু খুব সন্তর্পণে একটা ঘরে উঁকি মারল। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা। সে-ঘরে দুটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে। সন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে তাদের কাছে গিয়ে মুখ দেখল। তারই বয়েসী দুটি ছেলে, অচেনা।

বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে ঢুকল। চতুর্থ ঘরটায় সে দেখতে পেল জোজোকে। অন্য ছেলেটি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে আছে, জোজো ঘুমোচ্ছে চিত হয়ে। সন্তু একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। উঃ কতদিন পর দেখা হল জোজোর সঙ্গে! কলকাতায় একদিন দেখা না হলেই মনটা ছটফট করত।

সন্তু আস্তে-আস্তে ঠেলা দিতে লাগল জোজোকে। সে জানে, জোজোর গাঢ় ঘুম, সহজে ভাঙে না। হঠাৎ জেগেই না চেঁচিয়ে ওঠে! কয়েকবার ঠেলার পর জোজো চোখ মেলে তাকাতেই সন্তু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "চুপ! কোনও কথা বলিস না। আমি সন্তু, উঠে আয়।"

জোজো স্থির চোখে সন্তুর দিকে তাকিয়ে শুয়েই রইল।

সন্তু হ্যাঁচকা টানে তাকে উঠিয়ে বলল, "সময় নষ্ট করা চলবে না। শিগগির চল!"

জোজোর হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে সন্তু দৌড়ল সিঁড়ির দিকে। এখনও কোথাও কেউ জাগেনি। কামাল আর আলিকে কোথায় আটকে রেখেছে ? ওদের খুঁজতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই আমাকে আগে দেখতে পাসনি ?"

জোজো কোনও উত্তর দিল না।

সন্তু আবার বলল, "ওই আলখাল্লা পরা লোকটার পায়ে হাত দিচ্ছিলি কেন ? লোকটা কে ?"

জোজো এবার থমকে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, "আই অ্যাম আর নাম্বার ফোর্টিন, হু আর ইউ ?"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে বলল, "সে কী রে জোজো ? তুই আমায় চিনতে পারছিস না ? আমি আর কাকাবাবু তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

জোজো আবার একই সুরে বলল, "আমার নাম্বার আর ফোর্টিন, তোমার নাম্বার কত ?"

সন্তু বলল, "অত জোরে কথা বলিস না। নাম্বার আবার কী ?"

জোজো নিজের হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আরও জোরে চিৎকার করল, "মিস্টার এক্স, মিস্টার এক্স কাম হিয়ার!"

সন্তু এবার জোজোর মুখ চেপে ধরে কাতরভাবে বলল, "জোজো কী করছিস ? এত কষ্ট করে তোর জন্য এলাম—"

জোজো আবার মিস্টার এক্স-এর নাম ধরে ডাকল।

এবার চারতলা থেকে নেমে আসতে লাগল একজন মুখোশধারী। নীচের তলা থেকেও দু'জন উঠে আসছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সন্তু একবার নীচে খানিকটা নেমে গিয়ে আবার উঠে এল ওপরে। তিনজন একসঙ্গে চেপে ধরল সন্তুকে, জোজো তার মুখে একটা ঘুসি মেরে বলল, "আই ওবে দ্য মাস্টার!"

আগের ঘরটাতেই আবার নিয়ে আসা হল সন্তুকে, তবে এবার হাত-পা বেঁধে রেখে গেল।

সেই অবস্থাতেই সন্তুর কেটে গেল পরের সারাদিন। কেউ তাকে একফোঁটা জলও দিল না। কিছু খাবারও দিল না। তার খোঁজ নিতেও এল না কেউ। খিদের চেয়েও সন্তুর জলতেষ্টা

পাচ্ছে বেশি। তবু সে নিজের মনকে বোঝাচ্ছে যে, আগেকার দিনে বিপ্লবীরা জেলখানায় নির্জলা অনশন করতেন। যতীন দাস বেঁচে ছিলেন তেষট্টিদিন! তার তো কেটেছে মাত্র দেড়দিন। এসব ভেবেও মন মানে না, বারবার সে শুকনো ঠোঁট চাটছে জিভ দিয়ে।

পা বাঁধা থাকলেও সে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এসেছে জানলার ধারে। জানলাটাও খুলতে পেরেছে। সারাদিন তার কেটে গেল জানলার ধারে। অনেকখানি সমুদ্র দেখা যায়, মাঝে-মাঝে দু-একটা ভটভটি নৌকো আর স্পিড বোট যাচ্ছে। এই দ্বীপের কাছে কেউ আসে না। কালকে দূর থেকে এই দ্বীপটাকে কী সুন্দর আর নির্জন দেখাচ্ছিল অথচ এখানে কতসব কাণ্ড চলছে।

এত ছেলেকে এখানে চুরি করে আনার উদ্দেশ্যটা ঠিক কী, এখন বোঝা যাচ্ছে না। ওই যে আলখাল্লা-পরা লোকটাকে সবাই মাস্টার অর্থাৎ প্রভু বলে, সেই লোকটার সব হুকুম এখানে সবাই অন্ধের মতন মেনে চলে। লোকটার একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা আছে, চোখ দিয়ে সবাইকে বশ করে ফেলে। ওর চোখের মণিদুটো হিরের মতন জ্বলজ্বল করে। সন্তু দূর থেকে দেখেছে, ওর সামনে গিয়ে সেজন্যই চোখ বুজে থেকেছে।

মুখোশধারী এখানে পাঁচ-ছ'জন আছে, তারা কর্মী, এই জায়গাটা পাহারা দেয়, অন্য কাজকর্ম করে। মুখোশ পরে থাকে কেন কে জানে! বাইরের লোকদের ভয় দেখাবার জন্য? তাদের চেয়ে কিন্তু জোজো আর তার বয়েসী ছেলেদের খাতির বেশি। এদের পোশাকও ভাল, সাদা ফুলপ্যান্ট আর নীল রঙের কোট। সারাদিন ধরে ওই ছেলেদের নানারকম ব্যায়াম করতে দেখেছে সন্তু। আশ্চর্য ব্যাপার, তারা কেউই প্রায় কোনও কথা বলে না। হাঁটা-চলা যন্ত্রের মতন। ওদের মধ্যে জোজোও আছে।

জোজোর দিকে যতবার চোখ পড়ছে, ততবার চোখ ফেটে জল আসছে সন্তুর। জোজো বেশ জোরে একটা ঘুসি মেরেছিল, চোয়ালে ব্যথা হয়ে আছে। জোজো তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সে তাকে ঘুসি মারল? জোজোই কাল রাত্রে তাকে ধরিয়ে দিল! জোজো কি সত্যি জীবন্ত রোবট হয়ে গেছে?

সন্তু কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। কিছুতেই ওই লোকটাকে মাস্টার বলে ডাকবে না। ওরা যদি তার চোখ গেলে দেয়, কেটে কুচি-কুচি করেও ফেলে, তবু সন্তু রোবট হবে না। সে মানুষ হয়েই মরবে।

সেই আলখাল্লা পরা মাস্টারকে অবশ্য দিনের বেলা একবারও দেখা যায়নি। কাল ছাদ থেকে যেটাকে লঞ্চ বলে মনে হয়েছিল, সেটা সত্যিই একটা লঞ্চ, এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই দ্বীপ থেকে একটি স্পিড বোট মাঝে-মাঝে যাতায়াত করছে সেটার কাছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, সন্তু দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। নীচে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওপর তলাতেও কোনও লোকজনের শব্দ নেই। সবাই কোথাও চলে গেল নাকি? মাঝে-মাঝে কি ওরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়? সন্তুর কথা কি সবাই ভুলে গেছে? এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার তো কোনও উপায়ই নেই। কেউ যদি এখানে না থাকে, তা হলে সন্তু না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে! কাকাবাবু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন। আর যদি বেঁচে না থাকেন... নাঃ, তা হলেও সন্তু না খেয়ে মরতে রাজি নয়। আজ রাতটা সে দেখবে, তারপর জানলায় উঠে ঝাঁপ দেবে নীচে।

আর একটু রাত হওয়ার পর দরজা খুলে গেল। দু'জন মুখোশধারী এসে তার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটা বাঁধল

কোমরে। তারপর দড়িটা ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল নীচে। সন্তু যেন একটা গোরু কিংবা ছাগল।

অনেকটা হাঁটিয়ে সন্তুকে তারা একটা স্পিড বোটে তুলল। সেটা যেতে লাগল লঞ্চটার দিকে। সন্তু একবার ভাবল, হাত-বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু তার কোমরের দড়িটা একজন শক্ত করে ধরে আছে। দেখা যাক এর পরে কী হয়?

লঞ্চের ভেতরে একটা বড় হলঘরের মতন। সেখানে বসে আছে জোজোর বয়েসী সবক'টি ছেলে। সন্তুকে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের একপাশে। মাস্টারের আজ অন্যরকম পোশাক, সাদা প্যান্টের ওপর একটা লম্বা কালো মখমলের কোট, সেটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা, বুকপকেটে একটা সাদা ফুল গোঁজা। একটা ছোট টেবিলের ওপাশে সেই সিংহাসনের মতন উঁচু চেয়ারটা রাখা হয়েছে। মাস্টার তাতে বসেনি, দাঁড়িয়ে আছে, হাতে সেই সোনালি দণ্ড।

সন্তুকে দেখে মাস্টার বলল, "ওয়েলকাম অন বোর্ড।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল।

মাস্টার হেসে বলল, "খুলবে, খুলবে, চোখ খুলবে। যখন জানবে তোমার সামনে কী দারুণ ফিউচার আমি তৈরি করে দেব।"

তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "বয়েজ, তোমাদের পারফরমেন্স দেখে আমি খুশি! তোমাদের ট্রেনিং এখানে অর্ধেক কমপ্লিট হয়েছে। এখানে বাইরের লোক এসে ডিসটার্ব করছে, তাই আমরা অন্য জায়গায় চলে যাব। তোমরা হবে আমার প্রাইভেট আর্মি। তোমাদের কেউ বন্দি করতে পারবে না, কোনও কারাগার তোমাদের আটকে রাখতে পারবে না। অসীম শক্তি হবে তোমাদের।"

সন্তু জোজোর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু জোজো তার দিকে তাকাচ্ছেই না একেবারে, সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মাস্টারের দিকে।

মাস্টার বলে চলেছে, "তোমরা কেউ কারও নাম করবে না, সবাই এক-একটা নাম্বার, তবু প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করবে। আমি তোমাদের সুপ্রিম কম্যান্ডার। আমি যখন তোমাদের যে-কোনও জায়গায় যেতে বলব, তোমরা যাবে। কোনও প্রশ্ন করবে না। বুঝেছ?"

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "ইয়েস মাস্টার!"

মাস্টার আবার বলল, "তোমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ থাকবে না। আমিই তোমাদের সব। তার বদলে তোমরা চমৎকার জায়গায় থাকবে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল খাবার খাবে। বুঝেছ?"

আবার সবাই বলে উঠল, "ইয়েস মাস্টার!"

মাস্টার বলল, "তোমাদের ট্রেনিং যখন কমপ্লিট হবে..."

হঠাৎ এই সময় বাইরে একটা গুলির শব্দ হল। খুব কাছেই। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, "পুলিশ! তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। সারেন্ডার করো। সবাই হাত তুলে দাঁড়াও। নইলে গুলি করা হবে!"

সন্তুর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। এ তো কাকাবাবুর গলা!

একটা ছোট লঞ্চ এসে এর পাশে ভিড়েছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, তাঁর হাতে একটা রাইফেল। আরও চারজন পুলিশ তাঁর পাশে রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

মাস্টার জানলা দিয়ে দেখল বাইরে। সে একটুও চঞ্চল হল না। ছেলেদের বলল, "তোমরা চুপ করে বসে থাকো। তোমরা ভয় পাবে না জানি। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই তোমরা ভয়

পাবে না।"

তারপর তার মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত হাসি।

কাকাবাবুর বগলে একটামাত্র ক্রাচ, তাও বাঁশের তৈরি। তিনি সেটাকে প্রথমে এই লঞ্চের ওপর ছুড়ে দিলেন, তারপর লাফিয়ে চলে এলেন এদিকে। জানলায় দেখতে পেলেন মাস্টারের মুখ।

কাকাবাবু তাকে বললেন, "হাত তুলে বাইরে এসো। তোমার খেলা শেষ।"

মাস্টার বলল, "আমি পৃথিবী জয় করতে চলেছি, আর আমার খেলা শেষ করবে একটা খোঁড়া লোক? আর কয়েকটা সেকেলে বন্দুকধারী সেপাই? হাঃ হাঃ হাঃ, তুই আবার মরতে এসেছিস! দ্যাখ এবার কী হয়!"

এই লঞ্চ থেকে কেউ দুটো বোমা ছুড়ে দিল পুলিশের লঞ্চে। সাধারণ বোমা নয়, শব্দ হল না, ফাটল না। তার ভেতর থেকে আগুন বেরুল প্রথমে, তারপর গলগলিয়ে ধোঁয়া। পুলিশ চারজন ঘাবড়ে গিয়ে এলোমেলো গুলি চালাল কয়েকবার, তারপর তাদের হাত থেকে বন্দুক খসে গেল, তারা নিজেরাও নেতিয়ে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

কাকাবাবু পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন ঘরটায়। রাইফেল তুলে বললেন, "ওতে কোনও লাভ হবে না। আর একটা বড় জাহাজ-ভর্তি সৈন্য আসছে পঞ্চাশজন। একটু পরেই এসে পড়বে। তাদের ওই ধোঁয়া দিয়ে কাবু করতে পারবে না। ততক্ষণ কেউ নড়বে না। এদিক-ওদিক করলেই আমি গুলি চালাব!"

মাস্টার আবার হেসে উঠে বলল, "বটে? গুলি চালাবে? গুলি চালিয়ে ক'জনকে মারবে? ঠিক আছে, তুমি প্রথমে একে মারো।"

জোজোর দিকে আঙুল তুলে বলল, "আমি জানি, তুমি এই ছেলেটির খোঁজে এসেছ, তাই না?"

সে জোজোকে হুকুম দিল, "রোবট নাম্বার ফোর্টিন, যাও, এগিয়ে যাও, গো, গেট হিম।"

জোজো স্প্রিং-এর মতন দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাত মেলে এগিয়ে গেল কাকাবাবুর দিকে। একেবারে রাইফেলের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

কাকাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "জোজো, এ কী করছ? সরে যাও। আমার সামনেটা ক্লিয়ার করে দাঁড়াও!"

জোজো যেন সে-কথা শুনতেই পেল না।

মাস্টার আবার হুকুম দিল, "গ্র্যাব হিম! গেট দা রাইফেল!"

জোজো এবার কাকাবাবুর রাইফেলটা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

সন্তুর খুব ইচ্ছে হল কাকাবাবুকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যেতে। কিন্তু তার হাত পেছন মুড়ে বাঁধা। কোমরের দড়িটা একজন ধরে আছে। তবু সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সেই লোকটি আবার জোর করে বসিয়ে দিল।

কাকাবাবু চিৎকার করছেন, "জোজো, ছাড়ো, ছাড়ো। হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাবে! জোজো, প্লিজ, প্লিজ, ওরা তোমার শত্রু, ওদের সাহায্য কোরো না।"

মাস্টার আরও কয়েকটি ছেলেকে বললেন, "যাও, ওকে চেপে ধরো। গ্র্যাব হিম।"

চারটি ছেলে ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর কেউ গলা টিপে ধরতে গেল, কেউ কোমরটা জাপটে ধরল। কাকাবাবু খুব অসহায় হয়ে পড়লেন। জোজোর কাছ থেকে তিনি রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু জোজোকে তিনি মারবেন কী করে? সে

প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভর বয়েসী অন্য ছেলেগুলোকে মারতেও তাঁর হাত উঠল না।

তিনি রাইফেলটা ফেলে দিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে-ঠেলে ছেলেগুলোকে সরাবার চেষ্টা করলেন।

রাইফেলটা পড়ামাত্র কয়েকজন মুখোশধারী ছুটে গিয়ে কাকাবাবুকে দেওয়ালে ঠেসে ধরল।

মাস্টার এবারে তৃপ্তির হাসি দিয়ে বলল, "ফিনিশ্ড! ক' মিনিট লাগল? বয়েজ, তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। এক্সেলেন্ট! দেখলে তো, তোমাদের কেউ হারাতে পারবে না। তোমরা সবসময় জিতবে!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই লোকটা বেঁচে ফিরে এল কী করে? ঠিকমতন ওকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তো? ঠিক আছে, এবারে ওকে এমন শিক্ষা দেব, ওকে আমি একটা কুকুর বানাব। ও আমার সব কথা শুনবে, আমার পায়ের কাছে কাছে থাকবে! ওকে আমার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে এসো! তোমরা সবাই বসে থাকো!"

পেছনদিকের দরজা খুলে একটা ছোট ঘরে গেল মাস্টার। মুখোশধারীরা কাকাবাবুকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলল সেই দিকে।

সেই ছোট ঘরখানা নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও রয়েছে। মুখোশধারীদের চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে সে কাকাবাবুকে বলল, "বোসো! আর দশ মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার নিজের নামটাও ভুলে যাবে। তোমাকেও একটা মুখোশ পরিয়ে দেব, তুমি নিজের মুখটাও আয়নায় দেখতে পাবে না। তুমি হবে আমার স্লেভ। আমি মাস্টার, তুমি স্লেভ।"

কাকাবাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, তিনি বললেন, "তুমি তো দেখছি একটা পাগল!"

লোকটি গর্জন করে উঠে বলল, "কী, পাগল? এখনও তুমি আমার সব ক্ষমতা দ্যাখোনি।"

কাকাবাবু বললেন, "এত ছেলেকে তুমি চুরি করে আনিয়েছ কী মতলবে? সব এক বয়েসী?"

লোকটি বলল, "বাছাই-করা ইন্টেলিজেন্ট ছেলে। ঠিক এই বয়েসটাতে ভাল ট্রেনিং নিতে পারে। এই বয়েসের ছেলেরা বিপ্লব করে। যুদ্ধে যায়। এরা মরতে ভয় পায় না। এরা কোনওদিন লিডারের কথার অবাধ্য হয় না। আমি শুধু লিডার নই, আমি ওদের মাস্টার, ওদের প্রভু। ওরা আরও ওই বয়েসী ছেলে জোগাড় করে আনবে। একটা বিশাল আর্মি হবে। আমি ওদের দেশে-দেশে ছড়িয়ে দেব! ওরা সব ব্যাঙ্ক ভেঙে টাকা লুট করে আনবে। অস্ত্রশস্ত্র লুট করে আনবে। পৃথিবীর সব টাকা আমার হবে। আমি হব পৃথিবীর রাজা! তুমি হবে আমার চাকর! আমার পা চাটবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ যে বদ্ধ উন্মাদের মতন কথা! পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি? হিটলার হতে চাও!"

লোকটি রাগে নিশপিশ করতে-করতে বলল, "হিটলার যা পারেনি, আমি তাই দেখিয়ে দেব! আমি পৃথিবীর যে-কোনও মানুষকে বশ করতে পারি। আমার চোখের সামনে কেউ পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে পারে না। এইবার দ্যাখো!"

সে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাত ঘুরিয়ে সম্মোহনের ভঙ্গি করল।

কাকাবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, "এই মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। একজনের কাছে আমি শপথ করেছিলাম, আমার ওপর কেউ এই বিদ্যে ফলাবার চেষ্টা না করলে আমি নিজে থেকে কক্ষনও কাউকে হিপনোটাইজ করব

না। এখন আর বাধা নেই। শোনো, তুমি ওই ছোট-ছোট ছেলেগুলোকে সম্মোহিত করে রেখেছ বলে ভাবছ যে আমাকেও পারবে ? ওহে, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে সম্মোহিত করে এমন সাধ্য দুনিয়ায় কারও নেই !"

লোকটি এবার চমকে উঠে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী ? তুমি ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাম শুনেছ তা হলে ?"

লোকটি টেবিলের ওপর একটা বেল বাজাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু তার হাত চেপে ধরলেন। কড়া গলায় বললেন, "তোমার পাঁচ মিনিট লাগে, আমার তাও লাগে না।"

লোকটি মুখ নিচু করে ফেলেছিল, কাকাবাবু তার চিবুকটা ধরে উঁচু করে দিলেন। সে তবু দুর্বলভাবে বলল, "পারবে না, তুমি আমাকে পারবে না ! তার আগে আমি তোমাকে—"

দু'জনে দু'জনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। মাস্টারই আগে চোখ বুজে ফেলল। কাকাবাবু জলদমন্দ্র স্বরে ধমক দিলেন, "চোখ খোলো !"

সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার চোখ খুলল। তার চোখের মণি স্থির হয়ে গেছে। পলক পড়ছে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

সে বলল, "আমি তোমার ভৃত্য !"

কাকাবাবু আবার বললেন, "তুমি আমার সব কথা মেনে চলবে ?"

সে বলল, "ইয়েস মাস্টার !"

কাকাবাবু বললেন, "প্রমাণ দাও, এই দেওয়ালে তিনবার মাথা ঠোকো !"

সে অমনই পেছন ফিরে দড়াম-দড়াম করে বেশ জোরে মাথা ঠুকল তিনবার।

কাকাবাবু বললেন, "হাত দুটো মাথার ওপরে তোলো! এইবার চলো ওই ঘরটায়!"

লোকটি থপ-থপ করে এগিয়ে চলল। দরজাটা খুলে বড় ঘরটায় এসে কাকাবাবু বললেন, "এদের সবাইকে বলো, যে যেখানে বসে আছে, সেখানেই থাকবে। কেউ যেন আমার গায়ে হাত না দেয়।"

লোকটি বলল, "সবাই বসে থাকো। ইনি তোমাদের মাস্টারের মাস্টার। কেউ এর গায়ে হাত দেবে না!"

কাকাবাবু ক্রাচটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিলেন। সন্তু নিজেই এর পরে খুলে নিল কোমরের দড়ি।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে কে মেরেছিল, তুই দেখেছিস?"

কোনও একজন মুখোশধারীকে সন্তু মারতে দেখেছিল। কিন্তু এদের মধ্যে ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু আবার মাস্টারের কাছে এসে বললেন, "কে আমাকে মেরেছিল? বলো!"

সে আঙুল তুলে একজন মুখোশধারীকে দেখিয়ে দিল।

কাকাবাবু একটানে তার মুখোশটা টেনে খুলে দিলেন। মাথাজোড়া টাক, ভুরু নেই, এই সেই লোকটি।

কাকাবাবু বললেন, "তুবরক! তুমি এখানে এসে জুটেছ? ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স কোথায়? ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। শোনো, আমার গায়ে যে হাত তোলে, তাকে আমি ক্ষমা করি না। এ-ব্যাপারে আমার কোনও দয়ামায়া নেই! মানুষকে যখন মারো, তখন মনে থাকে না যে তোমাকেও ওইরকমভাবে কেউ মারলে কেমন লাগবে? এবার দ্যাখো কেমন লাগে।"

ক্রাচটা তুলে কাকাবাবু দড়াম-দড়াম করে তাকে দু'বার মারলেন। তার কানের পাশটায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল।

কাকাবাবু এবার মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি এত ছেলের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে! মা-বাবার কাছ থেকে ওদের কেড়ে এনেছ! ওরা মেসমেরাইজ্‌ড হয়ে আছে। ওটা কী করে কাটিয়ে দিতে হয় তাও আমি জানি। তুমি আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। অর্থাৎ তুমি একটা খুনি। এবার তোমার কী শাস্তি হবে?"

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু সরে যাও, সরে যাও, তোমার পেছনে—"

মেঝেতে পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে সে তক্ষুনি একবার গুলি চালিয়ে দিল।

একজন মুখোশধারী এই ঘরের বাইরে ছিল, সে একটা তলোয়ার নিয়ে চুপিচুপি পেছন দিক থেকে মারতে এসেছিল কাকাবাবুকে। প্রায় কোপ মেরেছিল আর একটু হলে, ঠিক সময় সন্তু গুলি করেছে।

লোকটি মরেনি, গুলি লেগেছে তার কাঁধে, মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। মস্ত বড় তলোয়ারটির দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "বাপ রে, লাগলেই হয়েছিল আর কী! সন্তু, তুই আর একবার আমার প্রাণ বাঁচালি। আর কেউ বাইরে আছে? মাস্টার, আর কেউ আছে বাইরে?"

মাস্টার দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই তবু রাইফেলটা রেডি করে রাখ। আর কেউ ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করবি।"

তারপর মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার শাস্তি আমি

ঠিক করে রেখেছি। আমার সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ, তুমিও ঠিক সেই ব্যবহার পাবে। রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার! আমাকে তুমি রাত্তিরবেলা মাঝসমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলে, তোমাকেও ঠিক ওই একই ভাবে এই রাত্তিরেই সমুদ্রে ফেলে দেব। তারপর তুমি বাঁচতে পারো কি না দ্যাখো!"

এর পর তিনদিন কেটে গেছে।

কাকাবাবু আর সন্তুর কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না। কক্সবাজারে তাদের খাতিরযত্নের অন্ত নেই। যে ছেলেগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ন'জনই বাংলাদেশের। বিভিন্ন জেলা থেকে এদের চুরি করা হয়েছিল। তাদের আনন্দের শেষ নেই। নিপু নামে ছেলেটির বাবা নিজে ছুটে এসেছেন এখানে, কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, "রায়চৌধুরীদাদা, আপনি শুধু আমার ছেলেকে বাঁচাননি, আমার স্ত্রীকেও বাঁচিয়েছেন, ছেলের শোকে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে খাওয়াদাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের বাসায় আপনাদের কিছুদিন থাকতেই হবে।"

প্রতিদিন দু' বেলাই খুব খাওয়াদাওয়া চলছে। দলে-দলে লোক আসছে কাকাবাবুকে দেখার জন্য। টুরিস্ট লজ ছেড়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে কাকাবাবু চলে এসেছেন আজ, সেখানে সহজে কেউ ঢুকতে পারে না।

মাস্টার নামে সেই লোকটিকে আর শেষপর্যন্ত সমুদ্রে ডোবানো

হয়নি। তাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা স্পিড বোটে চাপিয়ে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর চ্যাংদোলা করতে যেতেই সে শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ল। হাউহাউ করে কেঁদে কাকাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "আমাকে বাঁচান, আমাকে দয়া করুন, আমি সাঁতার জানি না!"

এখন তাকে রাখা হয়েছে জেলে। তার বিচার বাংলাদেশে হবে, না ভারতে হবে, তা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। তবে জেলের প্রহরীদের যাতে সে সম্মোহিত না করতে পারে, সেই জন্য চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে তার।

জোজো প্রায় টানা ঘুমিয়েছে দু'দিন। কিছু খেতেও চায়নি। আজ সকাল থেকে সে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে তার খিদে। সকালে লুচি, কিমার তরকারি ও ডাবল ডিমের ওমলেট খেয়েছে। আবার এগারোটার সময় তার খিদে-খিদে পাওয়ায় সে খেয়েছে চারটে রসগোল্লা, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দু'রকম মাংস আর তিনরকম মাছ, আর বিকেলে চায়ের সঙ্গে একটা পদ্মফুল সাইজের কেক।

সন্ধেবেলা বাংলোর দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছে সবাই। এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়। আস্তে-আস্তে রং পালটাচ্ছে আকাশের। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট জাহাজ, তার সারা গায়ে ঝলমল করছে আলো।

জোজো একটা সিল্কের পাজামা ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে রয়েছে। ওই পোশাক সে উপহার পেয়েছে নিপুর বাবার কাছ থেকে, সন্তুও পেয়েছে অবশ্য। কাকাবাবু কারও কাছ থেকে কিছু নেন না। জোজো একটা ইংরিজি বই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আলমারি থেকে এনে পড়ছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে জোজো, এই যে এতসব কাণ্ড

ঘটে গেল, তোর মনে আছে কিছু ?"

জোজো বলল, "মনে থাকবে না কেন, সব মনে আছে !"

সন্তু বলল, "তোকে কী করে ওই দ্বীপটায় নিয়ে গেল, তুই জানিস ?"

কামাল বলল, "না, না, আর একটু আগে থেকে শুরু করো।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কাকদ্বীপে সেই তাঁবুতে আমরা সার্কাস দেখতে গেলাম—"

সন্তু বলল, "তার মধ্যে মানুষ অদৃশ্য হওয়ার খেলা, তুই উঠে গেলি, তারপর কী হল ?"

জোজো বলল, "আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম !"

সন্তু, "যাঃ, তা কখনও হয় নাকি ?"

জোজো বলল, "তোরা বিশ্বাস করিস না। বলবি, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও কত কী ঘটে যাচ্ছে, যার কোনও ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। আমি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলাম।"

সন্তু বলল, "উড়তে লাগলি, মানে ঘুড়ির মতন ?"

জোজো বলল, "ঘুড়ি কেন হবে ? আমায় কেউ সুতো বেঁধে রাখেনি। পাখির মতন আমি যেদিকে খুশি উড়ে বেড়াচ্ছিলাম।"

সন্তু বলল, "তারপর আমরা যে তোর কত খোঁজ করেছিলাম, তুই সব দেখতে পেয়েছিলি ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। সব দেখতে পাচ্ছিলাম।"

সন্তু বলল, "দেখতে পেয়েও তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলিসনি কেন ?"

জোজো বলল, "বাঃ, অদৃশ্য হলে তো শরীরটাই থাকে না। মুখও থাকে না। মুখ না থাকলে কথা বলব কী করে ?"

সন্তু বলল, "মুখ না থাকলে তো চোখও থাকবে না। তা বলে

তুই দেখতে পেলি কী করে ?"

কামাল হেসে ফেলতেই কাকাবাবু বললেন, "এই সন্তু, তুই বাধা দিচ্ছিস কেন, ওকে সবটা বলতে দে ! হ্যাঁ জোজো, বলো, তারপর কী হল ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "অদৃশ্য হলে শরীর থাকে না, শুধু প্রাণটা থাকে। তাতে সব শোনা যায়, দেখা যায়, কিন্তু কথা বলা যায় না। সেইরকম উড়তে-উড়তে হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। মাঠের মধ্যে একটা বেশ বড় আর উঁচু রথ দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও অদৃশ্য !"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "রথ অদৃশ্য মানে ?"

জোজো বলল, "অদৃশ্য মানে অদৃশ্য ! অন্য কেউ সেটা দেখতে পাচ্ছে না। কেউ পাশ দিয়ে গেলে সেটার সঙ্গে ধাক্কাও লাগছে না। তখন আমি বুঝলাম, ওটা রথ নয়, একটা মহাকাশ রকেট, অন্য গ্রহ থেকে এসেছে। তার মানে বাইরে থেকে এরকম অনেক রকেট পৃথিবীতে আসে, অদৃশ্য হয়ে থাকে বলে আমরা কেউ টের পাই না। ওই ম্যাজিশিয়ানটা তো অন্য গ্রহের প্রাণী, মানুষ নয়, ইচ্ছেমতন মানুষের রূপ ধরতে পারে। রাত্তিরবেলা সেই ম্যাজিশিয়ান আর তার সহকারীও অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেই রকেটে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও।"

সন্তু আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "চুপ ! বলো জোজো, দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

জোজো বলল, "তারপর অন্য একটা গ্রহে পৌঁছে গেলাম।"

এবার কাকাবাবু নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন লাগল ?"

জোজো বলল, "অদৃশ্য রকেটের যে কী দারুণ স্পিড হয়, আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই যে আমেরিকানরা 'পাথফাইন্ডার' নামে একটা রকেট পাঠিয়েছে মঙ্গল গ্রহের দিকে,

সেটা পৌঁছতে সাত মাস সময় লাগবে। এই রকেটটা পৌঁছে গেল সাত ঘণ্টায়। কিংবা আট ঘণ্টাও হতে পারে, আমার হাতে তো ঘড়ি ছিল না। মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের চাঁদের পাশ দিয়ে সাত করে চলে গেল, এটা বেশ মনে আছে।"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোন গ্রহ?"

জোজো বলল, "তা ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মঙ্গল গ্রহ

হবে, সেটাই তো সবচেয়ে কাছে। আসলে ব্যাপার কী, এই যে মঙ্গল গ্রহ, বৃহস্পতি বা শনি, এই গ্রহদের আমরা নাম দিয়েছি, আমাদের দেওয়া এই নাম তো ওরা জানে না। ওরা অন্য নাম দিয়েছে। ওটা যদি মঙ্গল গ্রহ হয়, সেটার নাম ওরা দিয়েছে ককেটু।"

হেসে ফেলতে গিয়েও চেপে গিয়ে সন্তু বলল, "ককেটু? বেশ

নাম।"

জোজো বলল, "এই যে আমরা আমাদের গ্রহের নাম দিয়েছি পৃথিবী, সেটা তো ওরা জানে না। ওরা পৃথিবীকে বলে গিংগিল!"

কাকাবাবু নিজেই হাসতে-হাসতে বললেন, "গিংগিল, বাঃ এটাও বেশ ভাল নাম। তারপর তোমার ককেটু কেমন লাগল?"

জোজো বলল, "যেই ওখানে পৌঁছলাম, অমনই অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হয়ে গেলাম। মানে শরীরটা ফিরে এল। আর শরীরটা ফিরে আসামাত্র খিদে পেয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "প্লেনে যাওয়ার সময় যেমন কিছু খেতে দেয়, তেমনই রকেটে কিছু খাবারদাবার দেয়নি?"

জোজো বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল, "আবার ভুল করছেন, কাকাবাবু। অদৃশ্য অবস্থায় মুখই তো থাকে না, তখন খিদে পেলেও কিছু খাওয়ার উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো, ঠিকই! আমারই ভুল। ওরা খেতে দিল? কী খেতে দিল?"

জোজো বলল, "ভাত খায় না। ভাত কাকে বলে জানেই না। রুটিও চেনে না। চাওমিন খায়, অনেকটা চাওমিনের মতন আর কী! তার সঙ্গে একটা মাংস মিশিয়ে দেয়, সেটা কীসের মাংস ঠিক বুঝতে পারিনি। ইমপোর্ট করে আনে। মানে, অন্য গ্রহ থেকে নিয়ে আসে। চমৎকার খেতে, মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। ওদের সব শহর মাটির নীচে। ওপরটা তো খুব গরম। মাটির নীচে বেশ ঠাণ্ডা। ওখানকার প্রাণীরা খুব উন্নত, সায়েন্সের আবিষ্কারে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। যাতায়াতের অনেক সুবিধে। আমাদের এই যে মোটরগাড়ি, বাস, ট্রেন, এসব কিছু নেই। প্রত্যেকে হাতের সঙ্গে দুটো ডানা লাগিয়ে নেয়, তাতে

যন্ত্র ফিট করা আছে, সাঁ করে উড়ে যাওয়া যায়। সবাই উড়ে বেড়ায়, কোনও অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার চান্স নেই, কী সুন্দর দেখায়, মনে হয়, সবাই যেন দেবদূত। আমি যখন উড়তাম, আমাকেও নিশ্চয়ই দেবদূত বলেই মনে হত!"

সন্তু বলল, "ছবি তুলে আনিসনি? ইস!"

জোজো বলল, "ওখানে আমার বেশ ভাল লাগছিল। প্রাণীগুলো খুব ভদ্র। কেউ খারাপ ব্যবহার করে না। তাই আমি ওখানে থেকে গেলাম!"

সন্তু বলল, "থেকে গেলি কী রে? আমরা তো তোকে পেলাম এখানকার একটা দ্বীপে।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, বলছি, বলছি। থেকেই গেলাম, মানে কয়েকটা দিন। তারপর একটু একঘেয়ে লাগতে লাগল। ওরা তো তরকারি, শাকসবজি খায় না। আমার বেগুনভাজার জন্য মন কেমন করত। খালি মনে হত, কতদিন বেগুনভাজা খাইনি। আর একটা মুশকিল, ওরা নুন খেতে জানে না। সব খাবার আলুনি। সে কি বেশিদিন খাওয়া যায়? আমাকে পৃথিবী থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললে কিন্তু ওরা রাজি হয় না। একটা ভূমিকম্পে ওদের অনেক লোক মারা গেছে বলে ওরা অন্য গ্রহ থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। তখন আর আমি কী করি, একদিন চুপিচুপি ওদের একটি রকেট হাইজ্যাক করলাম। তা ছাড়া ওদের কথাবার্তা শুনে আন্দাজ করেছিলাম যে, ওরা গিংগিল গ্রহ থেকে কয়েক লক্ষ মানুষকে ধরে নিয়ে যাবে। তা ওরা পারে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, ওরা লড়াই করতে চাইলে পৃথিবীর লোক পারবে না, হেরে যাবে। তাই আমার মনে হল, তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার। দুটো লোক একটা রকেটের মধ্যে বসে কীসব করছিল, আমি

ক্যারাটের প্যাঁচে তাদের কাবু করে ফেলে দিলাম নীচে। তারপর রকেটটা নিয়ে সোজা একেবারে আকাশে। ওই রকেট চালানো খুব সোজা, সব প্রোগ্রাম করা থাকে, পরদায় ফুটে ওঠে মহাকাশের ম্যাপ, তাই পৃথিবী খুঁজে পেতে দেরি হল না। জানিস সন্তু, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর চাইনিজ ওয়াল দেখা যায়, আইফেল টাওয়ার দেখা যায়, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, আমাদের তাজমহলও দেখা যায়। মুশকিল হল, ল্যান্ড করব কোথায়, কী ভাবে ল্যান্ড করব, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। রকেটের মধ্যে ঢোকামাত্র আমি আবার অদৃশ্য, তার মানে শরীরটা নেই। এটা ওরা ভাল বুদ্ধি বার করেছে, অদৃশ্য হয়ে থাকলে জবরজং পোশাক পরতে হয় না, অক্সিজেনেরও সমস্যা নেই। পৃথিবীতে ফিরে শরীরটা আবার ফিরে পাব কি না সেটাও ভাবছিলাম। ল্যান্ড করার উপায় না পেয়ে পড়লাম এসে সমুদ্রে। রকেটটা চুরমার হয়ে গেল, আমি একটু আগে লাফিয়ে পড়েছিলাম বলে আমার লাগেনি। জলে ভাসতে-ভাসতে হাতে চিমটি কেটে দেখলাম লাগছে কি না। এত জোর চিমটি কেটেছি যে, নিজেই উঃ করে উঠেছি। তার মানে শরীরটা ফিরে এসেছে। ব্যস, তারপর আর কী, সমুদ্রে সাঁতার কেটে, থুড়ি, ঠিক সাঁতরে নয়, রকেটের একটা ভাঙা টুকরোয় চেপে পৌঁছে গেলাম একটা দ্বীপে। সেখানে একটা সাদা বাড়ি ছিল, ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। সেখানে তোদের সঙ্গে দেখা হল।"

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ। কামাল এরকম গল্প বলতে কাউকে আগে দেখেনি, জোজোকেও সে চেনে না। সে আর কথা বলতেও ভুলে গিয়ে হাঁ করে শুনছিল। সন্তু জোজোর কোল থেকে বইটা নিয়ে নাম দেখল। এইচ জি ওয়েলস্-এর লেখা 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'। সন্তু জোজোর চোখের দিকে চেয়ে

দু'বার মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "জোজো, তুই আমাকে আর কাকাবাবুকে কী যে বিপদে ফেলেছিলি, সেসব তোর মনে নেই ?"

এই প্রথম জোজো হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "তোদের বিপদে ফেলেছি ? সে কী ! তোর কথা আলাদা। কিন্তু কাকাবাবুকে আমি ইচ্ছে করে বিপদে ফেলব, তা কখনও হতে পারে ? অসম্ভব ! কী হয়েছিল বল তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, ওসব কথা এখন থাক। এতক্ষণ জোজোর ব্রেন ওভারটাইম খেটেছে, ওকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দে।"

কামাল এবার ধাতস্থ হয়ে বলল, "যা বলেছেন ! সমস্ত ব্যাপারটাই এখন ধাঁধার মতন। আচ্ছা কাকাবাবু, আপনার ব্যাপারটাও পুরোটা শোনা হয়নি। আপনাকে সমুদ্রে ফেলে দিল, সেখান থেকে বাঁচলেন কী করে ? সেটাও কি মিরাক্‌ল ?"

কাকাবাবু হেসে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, "সেসব কিছু নয়। একটা ভাগ্যের ব্যাপার আছে বোধ হয়। আমার বাঁচার কথা ছিল না। খোঁড়া মানুষ, প্যান্ট-কোট-জুতো-মোজা পরা। তার ওপর আবার অন্ধকার, কোনদিকে যাচ্ছি বোঝার উপায় নেই, এই অবস্থায় কতক্ষণ সাঁতরে বাঁচা যায় ? একটা লঞ্চ আমার কাছ দিয়ে চলে গেল, আমাকে দেখতে পেল না। তখনই বুঝলাম আর আমার বাঁচার আশা নেই। তার একটু পরেই সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল, আর পারছি না, সমুদ্রের নীচে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে, চিরঘুম যাকে বলে। আমি চিত হয়ে ভাসছিলাম তো, হাত-পা চালানো বন্ধ করে দিতেই শরীরটা সোজা হয়ে ডুবতে লাগল..."

থেমে গিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হল বলো তো ?"

কামাল বলল, "কোনও ফেরেশতা এসে আপনাকে বাঁচাল ?"

কাকাবাবু বললেন, "বিপদের সময় যে বাঁচায়, তাকেই দেবদূত মনে হয়। তখনও সেরকম কেউ আসেনি। এর পর যা হল, সেটাই মিরাক্‌ল বলতে পারো। শরীরটা সোজা হওয়ার পরই পায়ে কী যেন ঠেকল। প্রথমে মনে হল, হাঙর কিংবা তিমি নাকি ? তা হলেই তো গেছি! তারপর বুঝলাম, মাটি! আমার পায়ের নীচে মাটি! সেখানে পানি বেশি না। সমুদ্রের মাঝে-মাঝে এরকম চড়া পড়ে। আস্তে-আস্তে সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে যায়। জোয়ারের টানে আমি একটা চড়ায় এসে ঠেকেছি। সেখানে আমার বুকজল মাত্র। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর ঘুমোনো হল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেটে গেল সারারাত। ভেবে দ্যাখ দৃশ্যটা, চারপাশে সমুদ্র, তার মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সকালের দিকে ভাটা শুরু হতে পানি আরও কমে গেল। একটু বেশি বেলা হওয়ার পর একটা ভটভটি নৌকো তুলে নিল আমায়।"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "অদ্ভুত আপনার ভাগ্য। তারপর কী করলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ভাবলাম, একা-একা ওই দ্বীপে ফিরে গিয়ে কী করব ? রিভলভারটাও তো নেই। ওখানে অনেক লোক, আমাকেও লোকজন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ভটভটিটা আমাকে কক্সবাজার পৌঁছে দিল। সেখানে থানায় গিয়ে সাহায্য চাইলাম, তারা তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। প্রথমে আমাকে পাগল ভেবে হাসছিল। আমার ক্রাচ নেই, লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল, তাতে হাস্যকর দেখায় ঠিকই। সেদিনটা আবার শুক্রবার, শুক্রবার ছুটির দিন এ-দেশের সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। ক্রাচ পাব কোথায় ? একটা লোককে ধরে বাঁশ দিয়ে

কোনওরকমে একটা ক্রাচ বানিয়ে নিলাম। তারপর ঢাকায় সিরাজুল চৌধুরীকে ফোন করলাম, তিনি সব শুনে থানাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। তাও থানার অফিসার বলে যে একজন মন্ত্রী এসেছেন শহরে, পুলিশরা সবাই ব্যস্ত। ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারছে না। এত মানুষের জীবন বিপন্ন! যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে চারজন পুলিশ পেয়েছিলাম, আর একটা ভাঙা লঞ্চ!"

কামাল বলল, "আপনি যে ওদের বলেছিলেন, আর একটা আর্মির জাহাজ পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে একটু পরেই আসছে, সেটা গুল ?"

কাকাবাবু সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "মাঝে-মাঝে ওরকম গুল মারতেই হয়! কোথায় আর্মি ? তারা আমার কথা শুনবে কেন ? আমি বিদেশি না ? যাই হোক, কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেল! ওই মাস্টার লোকটা পাগল হলেও অন্যদিকে বুদ্ধি আছে। কীরকম একটা বোমা বানিয়েছে, যা দিয়ে মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করে রাখা যায়! ওটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

তারপর জোজোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "জোজো, তোমাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে কে জানো ? অনেকেই সাহায্য করেছে, যেমন ধরো কামাল, সে যদি আমাদের নিয়ে না যেত, আমরা নিজেরা অতদূরে যেতে পারতাম না। সে যথেষ্ট সাহসও দেখিয়েছে। তারপর স্পিডবোট চালক আলি, সে আমাদের দ্বীপটা চিনিয়েছে। আমাদের জন্য সে বিপদেও পড়েছিল। এবারে আমি বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু সন্তু, সন্তু যদি ঠিক সময় গুলি না করত, তা হলে ওই লোকটা তলোয়ারের এক কোপে আমার মুণ্ডুটা কেটে দিত। মুণ্ডু

না থাকলে কতরকম অসুবিধে বলো তো! আমার মুণ্ডুটা না থাকলে ওই মাস্টারটার ঘোরও কেটে যেত, সে তখন আবার নিজ মূর্তি ধারণ করত। সন্তু খুব জোর বাঁচিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে একটি মেয়ে। তার নাম অলি। ভালনাম রূপকথা। সেরকম মেয়ে দেখা যায় না, অপূর্ব মেয়ে! কলকাতায় গিয়ে আলাপ করিয়ে দেব।"

কাকাবাবুর চোখে ভেসে উঠল অলির কান্না-ভেজা মুখ। এর পরে একবার তাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে, তিনি কথা দিয়েছেন!